৪৫তম বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
পুরনো সংখ্যা থেকে		২
চোপ উন্নয়ন চলছে	পার্থপ্রতিম বিশ্বাস	৭
সবই বেদে আছে	মীরা নন্দা (অনু.আশীষ লাহিড়ী)	১০
ভরত মিলাপ	দীপাবলী সেন	১২
অকাল যৌবন	শঙ্কর ঘটক	১৪
রূপকথা-কমিক্স	অরুণালোক ভট্টাচার্য্য	১৬
চিকিৎসার পরামর্শ	গৌতম মিস্ত্রী	১৯
বিজ্ঞান ও কুসংস্কার	অঞ্জনকুমার সেনশর্মা	২২
আরজিকর ডায়েরি	পিনাকীকুমার গাঙ্গুলী	২৩
লিমেরিটনিক	অনার্য মিত্র	২৬
পুরুলিয়ার দাদু	সঞ্জয় অধিকারী	২৬
অরণ্য তুমি কার	শান্তনু গুপ্ত	২৭
পরিবেশ ও ফ্যাশন	নন্দগোপাল পাত্র	২৯
মাইক্রোপ্লাস্টিক	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০
বক্তৃতা কেমন হল	অঞ্জন ঘোষ	৩১
সংগঠন সংবাদ		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয় ঃ খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪, এস - ৩, পোঃ- (আর) গোপালপুর নারায়ণপুর কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক:http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

উৎস মানুষ পঁয়তাল্লিশে পা রাখল। এরকম একটি পত্রিকার এত বছর ধরে চলার কৃতিত্ব শুধু পরিচালকমণ্ডলীর নয়। কৃতজ্ঞতা জানাই লেখক ও পাঠকদের, যাঁদের সহযোগিতা না পেলে পত্রিকা এক পা-ও এগোতে পারত না।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার খবর আবার শিরোনামে। ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইডের কীটনাশক তৈরির কারখানা থেকে ১৯৮৪ সালের ৩ ডিসেম্বর ভোরে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় ১৫০,০০০ থেকে ৬০০,০০০ লোক আক্রান্ত হন এবং পরবর্তীতে এদের মধ্যে প্রায় ১৫,০০০ মারা যান। এই বিপর্যয়কে বিশ্বের সবচাইতে বড় শিল্প দুর্ঘটনা বলে মনে করা হয়। এদ্দিন পরে কারখানার ৩৩৭ মেট্রিক টন তেজষ্ক্রিয় বর্জ্য সরানোর কাজ শুরু হয়েছে।

চতুর্দিকে ধর্ম নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত হৈ-হল্লা হচ্ছে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু সেই বিরল বিজ্ঞানীদের একজন যিনি বলতে পেরেছিলেন, 'অবশ্য আমরা ধর্মের নামে খুব বেশি মেতে উঠি। তাই আমি ধার্মিকদের ভয় করি — বিশেষ করে ধর্মের কথা [যখন] বেশি করে বলেন, সে সময় তাঁদের কাছে না ঘেঁষাই শ্রেয়।' বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-র লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধিতি প্রণিধানযোগ্য---'হিন্দু ঘরে যার জন্ম, বাড়িতে ধর্ম-কর্মের চল আছে, গুরুজনদের সব কথা বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়াই রেওয়াজ—এমন পরিবারের ছেলেমেয়েদের মনে কিছু শব্দ গোড়া থেকেই গেঁথে যায়। যেমন, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, ইহকাল-পরকাল, ভূত-ভগবান। একটু বড় হলে আর-একটি ধারণাও মাথায় ঢুকে পড়ে। সেটি হল, নিষ্কাম কর্ম।'

সম্প্রতি মুম্বাইতে টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলনে দক্ষিণ ভারতের এক নামি হাসপাতলের মুখ্য পরিচালক, যিনি পেশায় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। দেশের কর্পোরেট হাসপাতালগুলিতে আধুনিক চিকিৎসার ৩০ শতাংশ যন্ত্রই অপ্রয়োজনীয়। তিনি আরো বলেন, রোগীকে একজন চিকিৎসক ডাক্তারি বিদ্যাবুদ্ধি এবং বিবেচনা দিয়ে সুস্থ করে তুলবেন, স্পর্শ এবং ক্লিনিক্যাল আই এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অথচ তা করা হয় না। এখন চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই পরীক্ষা নির্ভর হয়ে উঠেছে। একজন সুস্থ সবল মানুষকে হাজারগণ্ডা পরীক্ষা করিয়ে রোগের ভয় দেখিয়ে টাকা কামানো চলছে।

সরকারি ডাক ব্যবস্থা থেকে বুক-পোস্ট তুলে দেওয়া হল। উৎস মানুষ বরাবর বুক পোস্টে গ্রাহকদের পত্রিকা পাঠিয়ে এসেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে বুক-পোস্টে পাঠানো পত্রিকা অনেক গ্রাহকদের কাছে পৌঁছয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। নিরুপায় হয়ে স্পিড পোস্টে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা চালু করা হয়। সরকারির এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের মতো ছোট পত্র-পত্রিকা যে ভীষণ অসুবিধেয় পড়ল তা বলা বাহুল্য মাত্র।

গত ২৩ নভেম্বর ২০২৪ মহাবোধি সোসাইটি-র সভাকক্ষে চতুর্দশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দিলেন অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস। এই সংখ্যায় লিখিত আকারে প্রকাশিত হল। উৎস মানুষ আয়োজিত এই স্মারক বক্তৃতার খবর পত্রিকার ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছিল। দৈনিক সংবাদপত্র ও আকাশবাণীতে প্রচার করা সত্ত্বেও শ্রোতার উপস্থিতি আশানুরূপ হয় নি।

উৎস মানুষ প্রকাশনার 'স্বাস্থ্যের সাতকাহন' অখণ্ড ছিল। সেটি দুটি খণ্ডে ভাগ করা হল। প্রথমটি আসন্ন কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হবে।

লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ আয়োজিত ২ থেকে ৪ জানুয়ারি ২০২৫ কলেজ স্কোয়ারে যে মেলা হয়ে গেল তাতে উৎস মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতি বছরের মতো আসন্ন আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় উৎস মানুষের স্টল থাকছে। বইমেলায় উৎস মানুষের **৬৪৯** স্টলে সবাইকে আসার অনুরোধ রইল।

উমা

পুরনো সংখ্যা থেকে

'যোজনা'-র বিরল সংখ্যা থেকে

উৎস মানুষ মার্চ ১৯৯২

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগের এক গুরুত্বপূর্ণ মাসিক পত্রিকা 'যোজনা' (Yojana)। এর ১৫ অগাস্ট, ১৯৮৩ সংখ্যাটিকে কার্যত 'নিষিদ্ধ' করা হয়েছিল—বাজার থেকে ওই বিশেষ সংখ্যাটির সমস্ত অবিক্রিত কপি তুলে নিয়ে।

নিজস্ব এক প্রকাশনার প্রতি সরকারের এহেন রহস্যময় আচরণের কারণ কোথাও উল্লেখ করা হয় নি, ফলে সাধারণ কৌতূহলী মানুষকে আন্দাজ করে নিতে হয়েছে। 'যোজনা'-র 'অভিযুক্ত' সংখ্যাটি ছিল এক বিশেষ সংখ্যা (Special issue)—'বৈজ্ঞানিক মন, নাকি ঐতিহ্যের দাসত্ব (Scientific temper or bondage of tradition) শিরোনামে। এর সম্পাদকীয় মুখবন্ধে বলা হয়েছিল: '...ভারতের মতো একটি উন্নতিকামী দেশে অগ্রগতির অন্যতম অন্তরায় হলো সামাজিক অস্থিরতা ও অসুস্থতা। ব্যাপক মানুষের বৈজ্ঞানিক চেতনার অভাব বিপজ্জনক সামাজিক পরিণতি ডেকে আনছে অথচ দায়িত্বশীল সংস্থাগুলি আশ্চর্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং নির্বিকার। সরকারি গণমাধ্যমগুলি প্রয়োজনীয় চেতনা-বিকাশের কাজে অদ্ভুতরকম নিষ্ক্রিয়। কিন্তু কেন? এ-জাতীয় নির্লিপ্ততা কোনো সরকারি নীতির কারণে নিশ্চয়ই নয়। বরং আজকের পরিস্থিতি আমাদের বলতে বাধ্য করছে যে, দেশের গণমাধ্যমগুলির কর্তাব্যক্তিরা আত্মকেন্দ্রিক আমলাতন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বসে আছে যারা কোনোরকম সামাজিক দায়বদ্ধতায় মাথা না ঘামিয়ে নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততায় দিন কাটাতে অভ্যস্ত, যারা অর্থ, যশ বা বিদেশ-ভ্রমণের মতো লোভনীয় কোনো আকর্ষণ ছাড়া বিশেষ কোনো কাজে গা লাগানো পছন্দ করে না।...'

স্বভাবতই এ-ধরনের সত্যভাষণ, তা-ও আবার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে, দেশের হর্তাকর্তা আর আমলাদের যথেষ্ট বিব্রত, বিরক্ত করবে। তার ওপর আবার ওই সংখ্যার প্রায় সব ক-টি রচনাতেই দেশের ঐতিহ্য, ধর্ম, শিক্ষানীতি, প্রচার রীতি, বিজ্ঞান-চেতনা, সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কঠিন তথ্যনিষ্ঠ সমালোচনার চাবুক চালানো হয়েছে, যা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কাছে মোটেই স্বাদু বা প্রীতিকর হওয়ার কথা নয়। অনুমান, এসবেরই ফলশ্রুতিতে 'যোজনা'-র ওই বিশেষ সংখ্যাকে জবরদস্তি পড়তে-না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—যদিও তদ্দিনে বহু কপিই মানুষের হাতে পৌঁছেও গিয়েছিল।

আলোড়ন সৃষ্টি করার মতো কিছু ক্ষুরধার রচনার জন্ম দিয়েছিল যে পত্রিকা, 'যোজনা'-র ১৯৮৩ সালের ১৫ অগাস্টের সেই অধুনা-লুপ্ত সংখ্যাটি থেকে কয়েকটি নির্বাচিত নিবন্ধের অনুবাদ আজকের বাঙালী পাঠকদের কাছে হাজির করতে চাইছি আমরা মূল্যবান নিদর্শন হিসেবে। — স.ম.

কেন, কেন, কেন, এইসব ???

ড. পুষ্পা এম ভার্গব

[কেন, কোনো-না-কোনো গুরু কিংবা অবতারের প্রতি বিশ্বাস? কেন অতি-প্রাকৃত নিয়ে অন্ধ অসুস্থ বিশ্বাস? কেন জ্যোতিষ-নির্ভরতার মতো এসব অযৌক্তিকতা এত জনপ্রিয় হতে দেখা যায়? কেন এই ভণ্ডামি? এইসব আবর্জনার মধ্যে আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা আনতে হলে সমবেত প্রয়াসে বৈজ্ঞানিক মেজাজ বা বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা দরকার—আমাদের জনসাধারণের মধ্যে, রাজনীতিকদের মধ্যে, সরকারের মধ্যে এবং, এমনকি, আমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্যেও!]

'লিঙ্ক' পত্রিকার ৮ মে, ১৯৮৩ সংখ্যায় এক সংবাদ-কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল: '১১ এপ্রিল অপরাহ্নে গোপালগঞ্জের (উত্তরপ্রদেশ) জেলা প্রসাসক মহেশ প্রসাদ নারায়ণ শর্মা যখন তাঁর 'কালেকটরেট' অফিসের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন তখন তাঁর গায়ে কিছু একটা নিক্ষেপ করা হয়। মুহূর্ত কয়েক পরেই দেখা গেল শ্রী শর্মা সিঁড়ির নিচে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছেন, মৃত।

'অভিযুক্ত আততায়ী পরমহংস চৌধুরী প্রাথমিক স্বীকারোক্তিতে বলে যে, সে শর্মা সাহেবকে হত্যা করেছে কারণ শর্মা তার গুরু সন্ত্ জ্ঞানেশ্বরকে হেনস্থা করেছিল।

'সন্ত্ জ্ঞানেশ্বর নেহাৎ হেঁজিপেঁজি লোক নয়। ভারতীয় গুরু-বাবাদের মহলে যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং বাল যোগেশ্বর ও রজনীশের প্রভাবপুষ্ট দেওরিয়া জেলার এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম ছিল সদানন্দ ত্রিপাঠী, আইনের স্নাতক ছিলেন তিনি। শিক্ষাগত পেশায় না গিয়ে তিনি মনস্থ করেন ওই গুরুস্থানীয় অবতারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। এই লাইনে আসার পর অচিরেই তিনি ''সন্ত্ জ্ঞানেশ্বর'' নামে পরিচিতি লাভ করে ফেলেন।

'তিনি সরাসরি ভক্তদের ''ঈশ্বর দর্শন''-এর প্রতিশ্রুতি দিতেন যদি ভক্তগণ সমস্ত ''দেহ মন ও সম্পদ সমর্পণ'' করতে প্রস্তুত থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞানেশ্বর প্রভূত সংখ্যায় অনুগত ভক্ত পেয়ে যান, যাদের মধ্যে পূর্বইউ পি-র রাজনৈতিক নেতা এবং আমলারাও ছিল। এবং এরপরই সন্ত্ মহাশয়ের মহিলা অনুগামীদের প্রতি ''বিশেষ নজর'' নিয়ে কথা উঠতে শুরু করে। হিন্দী দৈনিক পত্রিকা ''আজ''-এর সংবাদ অনুসারে জানা যায়, জ্ঞানেশ্বরের বিরুদ্ধে দেওরিয়াতে একটি মামলা রুজু করা হয়েছিল নিজেরই ''চ্যালা'' আনন্দ বিহারী সহায়-কে হত্যা করার অভিযোগে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সহায় যখন তার স্ত্রীকে সন্ত্ বা ''বাবা''-র কাছে ''সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ'' করতে আপত্তি জানিয়েছিল তখনই তাকে হত্যা করা হয়েছে।

'পুলিশের নথিপত্র অনুসারে—জেলাশাসক শর্মা প্রথম বাবা-র আশ্রমে তল্লাশি চালান ন-মাস আগে। সেখানে ৩০টি মেয়েকে উদ্ধার করা হয়, যাদের আনা হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। অভিযোগ, এইসব মেয়েদের প্রত্যেককে বলাৎকার করা হয়েছে এবং এরা সকলেই তাদের ঘরে ফিরে যেতে উদ্গ্রীব।

'যদিও ওই সাধু মহারাজের অপকীর্তির নানা কাহিনী আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেয়ে আসছিল আগে থেকেই, কিন্তু শর্মা-র আগে আর কোনো (প্রশাসনিক) পূর্বসূরী সন্ত্কে স্পর্শ করার সাহস দেখান নি। সরকারি খাস জমি দখল করার অভিযোগ এসেছে তার বিরুদ্ধে, তথাপি কোনো ''কেস'' দায়ের করা হয় নি সন্তের বিরুদ্ধে। বোঝাই যায়, শর্মা যদি তাঁর পূর্বসূরীদের মতোই নির্বিকার থাকার পথা অবলম্বন করতেন তাহলে এহেন মর্মান্তিক পরিণতি তার হতো না।

কেন এই অতি-প্রাকৃতের প্রতি বিকারগ্রস্ত নির্ভরতা?

জ্ঞানেশ্বর-এর মতো এ-জাতীয় ঘটনা আমাদের দেশে যত্রতত্র ঘটছে। আর কেনই বা হবে না? যে-দেশে যাবতীয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাই কোনো-না-কোনো গুরু-বাবা কিংবা অবতারের ওপর ভরসা করে থাকেন সে-দেশে অন্য আর কী আশা করা যায়! মন্ত্রী এবং ওপরতলার রাজনীতিবিদ্রা, প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানীগণ, ভারতের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির সচিবগণ (এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আমলারা), উচ্চপদে আসীন শিক্ষাবিদেরা, যেমন---বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ইউ জি সি চেয়ারম্যান, এবং গণ্যমান্য বহু নাগরিক গুরু-বাবা-অবতার ও তাদের অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার ওপর অপার আস্থা পোষণ করে থাকেন। কেন এই অতি-প্রাকৃতের ওপর অদ্ভুতরকম বিকারগ্রস্ত নির্ভরতা?

আমাদের এই দেশের একজন নাগরিক নিজস্ব পরিচিতি পেতে চায় তার জাতি, উপ-জাতি বা ধর্মের পরিচয়ে, কিংবা নিজস্ব ভাষা অথবা সামাজিক সম্প্রদায়ের পরিচয়ে। এরকম খুব কম লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে যারা প্রথমেই নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচিত করতে চায়। এই অদৃশ্য বিচ্ছিন্নতা, দেশের এই ৭০ কোটি টুকরো টুকরো কণার মধ্যে ধ্বংসের, সর্বনাশের বীজ লুকিয়ে আছে। এদেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার জন্মসূত্রের পরিচয়ের সুবাদে আলাদাভাবে বিশেষ সুবিধা, বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। এমন মনোবৃত্তির জন্যই সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসগুলি দানা বাঁধতে পারে না—একমাত্র যে প্রয়াসই শুধু দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে; কেউ না—কোনো দু-জন নেই—যারা কোনো একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হবে, কেননা এরকম দু-জনকে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত মুশ্কিল যাদের জন্মগত অবস্থান পুরোপুরি এক, অনুরূপ! (দুজনের ঠিকুজি-কুষ্ঠি কিছুতেই অবিকল এক হবে না!)

একটা গল্প বলি যা থেকে ওপরের বক্তব্যের সমর্থনে বড়

প্রমাণ পাওয়া যাবে। একজন কেরালাবাসী বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তা পার হবে বলে।রাস্তায় বিস্তর গাড়িঘোড়ার ভিড়। ভদ্রলোক ধীরভাবেই অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু আচমকা দেখা গেল সেই কেরালাবাসী ট্রাফিকের তোয়াক্কা না-করে ছুট্টে চলে গেলেন ওপারে, রীতিমতো ঝুঁকি নিয়ে। প্রশ্ন: 'কেন সে এরকম করল?' উত্তর: 'সে রাস্তার ওপারে আরেকজন কেরালাবাসীকে দেখতে পেয়েছিল।' এ-কাহিনীটি কেবল যে কেরালাবাসীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা মোটেই নয়, এর মধ্যে আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় না, এরকম ঘটনা আমাদের মধ্যে প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। আসলে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি, যে-সত্য আধুনিক জীববিজ্ঞান ও বংশাণুতত্ত্বের গবেষণার ফসল, সেটি হলো—জন্মসূত্রে মানুষে মানুষে যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়ে থাকে, প্রভেদ সূচনা করা হয়ে থাকে, তা একেবারেই অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। যদি আদৌ কোনো পার্থক্য থাকে তাহলে তর্কের খাতিরে এমন উদাহরণও আনা যাবে যেখানে কম-সুবিধাভোগী নিম্নবর্গের মধ্যে (তাদের বর্ণ, শ্রেণী বা ধর্ম যাই হোক না কেন) কিছু মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ পাওয়া যাবে যাদের মেধা ও যোগ্যতা যুগ যুগ ধরে সুবিধাভোগী উচ্চবর্গের মানুষজনের থেকে বেশি। এরকম বাস্তব পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে মাত্র কয়েক লক্ষ ছোটো পরিবার কিংবা কয়েক সহস্র বৃহৎ পরিবার প্রায় সত্তর কোটি মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করে চলেছে। কেন এমন অসুস্থ অবস্থা? কেন এমনধারা বিভেদ, আর প্রভেদ কেবল জন্মগত অবস্থানের ভিত্তিতে? কেন ব্যক্তি মানুষের মেধা, ক্ষমতা ও কর্মনৈপুণ্য তার কৃতিত্বের কোনো মাপকাঠি হিসেবে গ্রাহ্য হয় না?

কেন এই কপটতা?

আমরা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কিছু বিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছি—যেমন দু-টির নাম করা যায়, জ্যোতিষবিদ্যা ও হোমিওপ্যাথি। এরকম বিষয়ে বিশ্বাস যে কতখানি ক্ষতিকারক সেটা ঠিকমতো পরিমাপই করা যায় না। কিন্তু মানুষ এদের প্রতি এত আকৃষ্ট হয় কেন?

আমাদের এই দেশে শ্রোতা কেউ নেই, সবাই বক্তা, কারণ প্রত্যেকেই মনে করেন, তিনি সবকিছু জানেন। কিছু শিক্ষা নেওয়ার বা জানার ইচ্ছার বড় অভাব। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি একথা মানতেই চান না যে, অপর একজনের জ্ঞান—বিশেষত অন্য কোনো জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠী, ধর্ম, রাজ্যের কোনো মানুষের জ্ঞান—তাঁর চেয়ে বেশি হতে পারে। কেন?

আমাদের মধ্যে পরিষ্কার দ্বিধাবিভক্ত ভূমিকা কাজ করে—আমরা যা বলি এবং যা কাজে করি, এ দুয়ের মধ্যে বিভাজন। এ দেশের জনসংখ্যার বিপুল গরিষ্ঠ অংশ আজও নিরক্ষর, স্বাধীনতার ৩৫ বছর (এই রচনার সময়কাল ১৯৮৩-অনু.) পরেও, যদিও শিক্ষাব্যস্থার পরিকাঠামো (উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাসহ) রয়েছে দিব্যি, যেমনটি কোনো উন্নয়নশীল দেশে নেই, চীনেও নেই। বেশ কয়েকটি দেশ যথেষ্ট দুর্বলতা ও স্বল্প সঙ্গতি সত্ত্বেও তাদের দেশবাসীকে অনেক বেশি শিক্ষিত করেছে। কেন? কেউ উত্তরে বলতে পারেন, আমাদের দেশে এই শিক্ষাগত অবনতির কারণ হলো দেশের সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থ, যাার দেশকে শাসন করছে, তারা চাইবে না ব্যাপক জনসাধারণ শিক্ষিত হয়ে উঠুক, কেননা তাহলে তাদের শোষণ করার কাজটা ক্রমে কঠিনতর হয়ে পড়বে। এবং আমাদের দেশে সুবিধাভোগী শ্রেণীর ননী-মাখনই হলো দলিত রিক্ত শ্রেণীর শোষণ। কিন্তু, তাহলে আবার প্রশ্ন আসবে, সেটাই-বা কেন?

পণ-যৌতুক আর বধু-হত্যার মতো ঘটনা এখানে ব্যাপক সংখ্যায় ঘটে। বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক প্রথাও বহাল তবিয়তে বিরাজমান, যদিও এসবগুলিই আইন-বিরুদ্ধ। দোষী ব্যক্তি প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই শাস্তি পায় না, যদিও আমাদের জানাই থাকে দোষী ব্যক্তিটি কে—এর কারণ, অপরাধীরা সাধারণভাবেই রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন মহলের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে থাকে। কেমন করে এটা হয়? কী সেই চাবিকাঠি যার দৌলতে ক্ষমতাবানেরা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েও দিব্যি অব্যাহতি পেয়ে যায়?

কেন এই অন্যায় অযুক্তির প্রতি বশ্যতা?

কুসংস্কার আর অযৌক্তিক বিশ্বাস আমাদের জীবনকে পরিচালিত করে। এরাই বলে দেয় কবে যাত্রা শুরু করতে হবে, বা ব্যবসায় নামতে হবে, কিংবা নতুন চাকরিতে কবে যোগ দিতে হবে, অথবা বিবাহের দিনক্ষণ কখন হবে। এরকম ধারায় ভাবলে, আমাদের কবে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল সেটাও বোধহয় ওই গণনা বা বিশ্বাসের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা। সম্ভবত একটি মাত্র ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ দিনক্ষণ নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা থাকে না, সেটা হলো—যে সময়ে বা দিনক্ষণে আমরা অসৎ বা স্বার্থপর হতে চাই (একটা ধর্মবিশ্বাসের মতো সত্য হলো, এযুগে, প্রত্যেকটি দিনই

অসততা ও প্রবঞ্চনার পক্ষে শুভদিন)। কেন এই অযৌক্তিকতার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ?

আমাদের দেশের একটা অলিখিত আইন-ই যেন হয়ে গেছে যা কিছু বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষিত, প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সে-সব বর্জন করতে হবে, কেবল বিশ্বাসকেই গ্রহণ করতে হবে—যা আদৌ পরীক্ষিত বা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত নয়। কেন এই তথ্য-সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি অশ্রদ্ধা?

স্বার্থপরতা, বিশৃঙ্খলা আর অসততা। কেন আমাদের জীবন এহেন আত্মকেন্দ্রিকতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে থাকে? আমি সবিনয়ে বলতে চাই, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা অথবা বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত অভাব হলো অন্যতম কারণ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর কারণগুলির মধ্যে অন্যতম।

জাতীয় প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি ফেলা যাক

আমি এতক্ষণ মোটামুটিভাবে ব্যক্তিমানুষের দিকে চোখ রেখে কথা বলছিলাম। এখন দেখা যাক, জাতীয় স্তরে কী চলছে?

আমাদের লক্ষ্য কখনোই পরিষ্কার নয়। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, দেশের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও সঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কতখানি অগ্রগতি আমরা আয়ত্ত করতে পারি, বাস্তব অবস্থায়, সে-বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো চিত্র, কোনো লক্ষ্য আমাদের সামনে কখনোই স্পষ্ট করে রাখা হয় নি। অন্যভাবে বলতে গেলে, একটি গোটা জাতি হিসেবে আমরা আমাদের শক্তি এবং দুর্বলতাকে আমাদের সম্ভাবনা ও সমস্যাকে মোটেই বস্তুনিষ্ঠভাবে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝতে শিখি নি, এবং তার ফলে বড় বড় সংকটগুলি সমাধানের জন্য উপযুক্ত কার্যকর পদ্ধতি নির্ধারণ করতে আমরা পারি নি। একজন বিজ্ঞানী যেমন প্রথমে সমস্যাটিকে পরিষ্কার বুঝে নিয়ে তারপর তার সমাধানের পদ্ধতি-প্রকরণ রচনার দিকে এগিয়ে যান, আমরা জাতীয় স্তরে সেভাবে আদৌ এগোতে পারি নি। দার্শনিক দেকার্ত-এর তর্কবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রের চারটি নিয়মের কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, যে নিয়ম বা সূত্রগুলি কোনো সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের কাজে অত্যন্ত কার্যকর মৌলিক কাঠামোর হদিশ দেবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এবং এই সূত্রগুলির বৈধতা ও কার্যকারিতা অসংখ্যবার পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়েছে, অথচ আমরা এগুলিকে সঠিকভাবে চিনতে পারি নি, উপলব্ধি করতে পারি নি। কাজে লাগাতে পারি নি—আমাদের তথাকথিত শিক্ষাগত ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও।

দেকার্ত-এর চারটি সূত্র হলো:

এক : আমার প্রথম সূত্র হলো, এমন কোনো কিছু সত্য বলে গ্রহণ না-করা, যাকে আমি নিঃসংশয়ে স্পষ্ট করে সত্য বলে জানতে পারছি না, এমন কোনো কিছু মেনে না-নেওয়া যা আমার নিজের বোধ-বুদ্ধির কাছে পরিষ্কারভাবে দ্বিধাহীনভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে না।

দুই : দ্বিতীয় সূত্র হলো, প্রত্যেক সমস্যা অথবা প্রতিবন্ধকতাকে যত বেশি সম্ভব অংশে বিভক্ত করে নেওয়া।

তিন : তৃতীয় সূত্র হলো, সহজ থেকে কঠিনে আরোহণের পদ্ধতি গ্রহণ করা। যে বিষয় বা বস্তুগুলিকে সহজে ও সরলভাবে বোঝা যাচ্ছে সেগুলিকে আগে বুঝে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে তারপর, একটু একটু করে ওপর দিকে উঠতে হবে, সবচেয়ে জটিল ও গভীর জ্ঞানের দিকে।

চার : আমার চতুর্থ সূত্র হলো, বিষয়-বর্ণনা এমন বিশদ ও সম্পূর্ণ করা, এবং পর্যালোচনা এমন সাবলীল ও সাধারণকৃত করা যাতে আমি নিজে নিশ্চিত হতে পারি যে কোনো কিছু বাদ পড়ে যায় নি।

আমরা ভুলে যাই যে, যে-সমাধানসূত্র কার্যকর নয়, তা দিয়ে কখনোই কার্যকর ফল পাওয়া যাবে না। কথাটা বাক্যের খেলা কিংবা শব্দ নিয়ে অনুলাপের মতো শোনাবে হয়তো কিন্তু এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আমাদের রাজনীতিবিদ্, প্রকল্পকার, প্রশাসকগণের মধ্যে অধিকাংশই কথাটির সত্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ। যে লক্ষ্য বা দিশা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় নি, উপলব্ধি করা যায় নি, যে লক্ষ্যে পৌঁছনোর পদ্ধতি-প্রকরণ নির্ধারিত হয় নি কিংবা লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রতি পদক্ষেপে পদ্ধতি নিরূপণের সম্ভাব্য বাস্তব ফর্মুলাও চোখের সামনে দেখতে নেই, সে লক্ষ্য-দিশা-উদ্দেশ্য রচনা করা ও ঘোষণা করা অর্থহীন। যে-কোনো সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান পেতে গেলে ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি অন্তত মেটা দরকার। আমাদের দেশীয় প্রকল্প-পরিকল্পনাগুলিতে এই প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি চিহ্নিত না করেই, কিভাবে তা সংগৃহীত বা সংরক্ষিত হবে সেটা সুনিশ্চিত না করেই সমাধান রচনা করা হয়ে থাকে। ব্যাপারটা অনেকটা যেন ল্যাবরেটরির পরীক্ষা শুরু করে দেওয়া, যে-পরীক্ষার ন্যূনতম দরকারি যন্ত্রপাতি বা উপকরণগুলিই হাজির নেই।

প্রকৃতপক্ষে, কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাফল্য নির্ভর করে, পরীক্ষার আগে কতখানি নিখুঁতভাবে তার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, তার ওপর।

আমাদের দেশের বৃহৎ কোনো জাতীয় সমস্যা সমাধানে অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু তা করা হয় না কারণ আমাদের রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের কাছে কাজের চেয়ে কথা বা বক্তৃতা বেশি বড়, এবং প্রশাসকদের কাছে ফাইল, ফিতে, নিয়ম আর নিষেধ প্রকৃত ফলাফলের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেন এরকম সহজ সাধারণ বিষয়টিতে (বিজ্ঞান আসলে সাধারণ বুদ্ধি-ই) এত নির্বুদ্ধিতা?

এবং কেন এইরকম অবস্থা?

নিয়ম-কানুনের অযথা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আমরা উদ্দেশ্য সম্পাদনে বিঘ্ন ডেকে আনি। এদেশে বুদ্ধিমান, দক্ষ, একনিষ্ঠ, পরিশ্রমী মানুষদের হেনস্থা হতে হয় বেশি। ১০০টি কাজের মধ্যে ৯৫টি সফলভাবে সম্পাদিত হলেও, ৫টির অনিচ্ছাকৃত ব্যর্থতার জন্য সেই কর্মী মানুষটিকে গঞ্জনা সইতে হয়, আক্রান্ত হতে হয়; অথচ যারা কৌশলে আর চাতুরিতে কোনোভাবে শতকরা ৫টি কাজে শুধু সুফল দেখিয়ে দেয়, তাদের ৯৫টিতে ব্যর্থতা সত্ত্বেও, গৌরবান্বিত করা হয়। কেন? প্রত্যয়, সততা ও বিশ্বস্ততার মূল্য জাতীয় পর্যায়ে বড়ই নিম্নমুখী। যাদের এইসব গুণগুলি রয়েছে, তারা অন্যদের দ্বারা বেশি নিগৃহীত, প্রবঞ্চিত হচ্ছেন দেখা যায়। দুর্নীতি আজকের জীবন-যাপনের এক অন্যতম অবলম্বন। আপনি যদি দুর্নীতিপরায়ণ না হন, তাহলে সমাজের 'সফল' ব্যক্তিদের কাছে আপনি উপহাসাস্পদ হয়ে যাবেন। কেন ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারার মতো এই মানসিকতা চলে আসছে?

আমাদের জীবনধারার বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে এই বিভাজন—আমরা যা বলি, যা বিশ্বাস করি এবং যা বাস্তবে করি, এদের পারস্পরিক অমিল বা অসামঞ্জস্য বিজ্ঞানের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এবং, আমরা নিজেদের যশ-প্রতিষ্ঠার একটি প্রতিকৃতি রচনা করতেই বেশি আগ্রহী, কোনো কাজকে পরিপূর্ণভাবে সম্পাদনের আগ্রহ আমাদের নিতান্তই কম। অন্য জাতির ক্ষেত্রে, যেমন জাপানি, একেবারেই আলাদা।

কারণটা হলো বিজ্ঞানমনস্কতার চরম অভাব

আবার সেই বৈজ্ঞানিক মন আর দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের কথা।

বিষয়টা জাতীয় স্তরে আরো বেশি দোষণীয়, কেননা দেশীয় নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বৈজ্ঞানিক মানসিকতার কাছে দায়বদ্ধ। দেশের সংবিধান অনুসারে একজন নাগরিক হিসেবে এই মানসিকতা পোষণ করা আমাদের কর্তব্য, কিন্তু কার্যত আমরা প্রায় সকলেই এ-কর্তব্যকে এড়িয়ে যাই। কিন্তু একজন সাধারণ নাগরিক কতটুকুই বা করতে পারে যেখানে দেশের শাসনকর্তাগণ আগা-পাশতলা বিজ্ঞানমনস্কতার বিরোধী! সত্যিই, এরকম একটি উদাহরণও নেই যেখানে সরকারি প্রয়াসে সংগঠিতভাবে দেশের ব্যাপক স্তরে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলা, কিংবা নিতান্তই, উৎসাহিত করার চেষ্টা হচ্ছে। যেমন, দেশে গুরু-বাবা-অবতারদের বাড়বাড়ন্ত রোধ করতে সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। ওরা মানুষকে ঠকায় আর কালো টাকাকে সাদা করে। যদি কেউ শূন্য থেকে একটা 'সুইস' ঘড়ি কিংবা এক লাখ টাকার বাণ্ডিল হাতের মুঠোয় এনে তার ভক্তকে দান করে, তাহলে সে সম্পদ নির্ঘাৎ কর (Tax)-এর আওতায় আসবে না! কেন না এরকম 'অলৌকিক' উপায়ে 'সৃষ্ট' বস্তুকে পবিত্র ছাই-এর মতোই ধরে নেওয়া হয়। অথচ, সরকারের বাধা কোথায়, যদি তারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী হয়, ওই জাতীয় ঘটনার তদন্ত করতে? কোন্ আইনে আটকায়? 'মানুষ ওই গুরুদের কাছে গেলে শান্তি পায়। কেন আজকের সমস্যাক্লিষ্ট বঞ্চিত মানুষের সামান্য শান্তিটুকু কেড়ে নিতে হবে?'—এরকম যুক্তি দেওয়া হয়; কিন্তু একেবারেই ভ্রান্ত এ যুক্তি। এটা সম্যক বোঝা দরকার যে, ওইসব অবতারের দল নিপুণভাবে মানুষকে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার কাজ চালিয়ে যায়; তারা কেবল মানুষের অলৌকিক—অবাস্তবের প্রতি বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয়, সে-বিশ্বাসকে এমনভাবে মনে গেঁথে দেয় যে, সাধারণ মানুষ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও (ভক্তি ও ধর্মভাব ছাড়া অন্যত্র) অযৌক্তিক অবিবেচকের মতো কাজ করে। এবং কিছু বিশ্বাসী মানুষের অযৌক্তিক কাজ ক্রমান্বয়ে আরো বেশি মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকে। এই কারণেই গুরু আর অবতারদের প্রতিহত করা উচিত, 'মনের শান্তি' পাওয়ার অপযুক্তিকে সম্যক বোঝা উচিত।

আমার ধারণা, আমি আমার বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট তথ্য যুক্তি হাজির করতে পেরেছি একথা বলার জন্য যে—যে-কোনো প্রকারে বৈজ্ঞানিক মন গড়ে তোলা দরকার সাধারণ মানুষের মধ্যে, রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে এবং আমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্যেও।

অনুবাদ : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

উমা

চতুর্দশতম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

বিষয় : 'চোপ উন্নয়ন চলছে'

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

প্রথমেই উৎস মানুষ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। আপনাদের অভিনন্দন জানাতে চাই কারণ এত সীমাবদ্ধতার মধ্যে পত্রিকাটা এখনও চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন। বিশেষত যে সময়ে আমরা বাস করছি সেখানে অশোকবাবুর ভাবনা সামাজিক প্রেক্ষিতে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে এবং এমন একটা সময়ে যখন অশোকবাবু বা অশোকবাবুদের মতো নেই, যাঁরা সেই পথ হাঁটা শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানমনস্কতার পক্ষে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটা আধুনিক মনন চিন্তন রাজ্য জুড়ে তৈরির লক্ষ্যে।

এই প্রেক্ষিতে পেশাগত ক্ষেত্রে আমার যা কিছু অভিজ্ঞতার খণ্ডচিত্র তুলে ধরব। একবিংশ শতাব্দীতে আমরা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়েছি। চাঁদের দক্ষিণমেরুতে যখন চন্দ্রযান নামে সবাই আমরা হাততালি দিই। ভারতবাসী হিসাবে খুব গর্বিত বোধ করি। ইসরো-র একদল বিজ্ঞানী চন্দ্রযানটা পাঠালেন। একটা বিস্ময় এখানে কাজ করে, ইসরোর চেয়ারম্যান সকাল থেকে উপোস করে মাথায় ছাই মেখে কম্পিউটারের সামনে বসেছিলেন। অনেকে মনে করতে পারেন এটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্বাস, কিন্তু তাঁর পেশাগত জীবন। এই দুটো জীবনের মধ্যে একটা অসম্ভব ভাল সম্পর্ক আছে। ব্যক্তিগত জীবনে যদি আপনি অন্ধত্বের শিকার হন, আপনি সামাজিক পরিসরে কখনও উন্মুক্তমনা মানুষ হতে পারেন না। ব্যক্তিজীবনের বিশ্বাস, বিশ্বাসের ভিত্তি, আচার আচরণ আমাদের সমাজজীবনে ও পেশাগত ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। ফলে এই দুটো আলাদা করাটা খুব কঠিন। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ফলে একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা বিচার করা যাবে না।

মনে রাখতে হবে যে উন্নয়নের বহু ধরনের ধারা আছে—শিক্ষার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ব্যবসার উন্নয়ন, অর্থনীতির উন্নয়ন ইত্যাদি। সেই নিরিখে পরিকাঠামোর একটা উন্নয়ন হচ্ছে নগরায়ন। নগর জীবনের উন্নয়নের ধারণা আমাদের কাছে ক্রমশ অস্পষ্ট হচ্ছে। উন্নয়ন শব্দটা কখনও নেতিবাচক ধারণা বহন করে না। কিন্তু সেই উন্নয়ন যখন নেতিবাচক ধারণা বহন করতে থাকে তখন তার সম্পর্কে দু'বার ভাবতে হয়। নগরায়ন যে পৃথিবী জুড়ে একটা স্রোত সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। মানুষ একসময়ে গ্রামে থাকত, গ্রাম ছেড়ে শহরতলি, শহরতলি থেকে শহর। এটা হচ্ছে transformation বা উত্তরণের গতি। ভারতবর্ষের আর্থিক সম্পদ কৃষি। কিন্তু এখন দেশের আয় কি কৃষি থেকে আসে? উত্তর হচ্ছে — না। আমাদের দেশের দুই তৃতীয়াংশ আসে শিল্প এবং পরিষেবা থেকে আর এক তৃতীয়াংশ আসে কৃষি থেকে। ফলে কৃষি ক্ষেত্রটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। পৃথিবী জুড়েই এই সমস্যা। এর পরিণতি হচ্ছে শহরে মানুষের ভিড় বাড়ছে। এরা আসে মূলত উন্নত জীবনের খোঁজে। মানুষ শহরমুখী হচ্ছে উন্নত আয়ের খোঁজে; যে আয় সে গ্রাম বা শহরতলি থেকে করতে পারছিল না। এর ফলে শহরে ক্রমশ জনঘনত্ব বাড়তে শুরু করল। জনঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে শুরু করল যানঘনত্ব। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি পরিকাঠামোর নিজস্ব ধারণ ক্ষমতা থাকে। ফলে নগরায়নের সাথে বেড়ে চলা শহরের পরিকাঠামোগুলির ধারণ ক্ষমতা যাচাই প্রয়োজন। শহরের এই ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ করা যায় সংখ্যারনিরিখে,

জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ পরিকাঠামো, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থার মতো বহুমাত্রিক মাপকাঠিতে। কিন্তু যদি শহরের ধারণ ক্ষমতাকে ছাপিয়ে যায় শহরের জনস্রোত তখন বাড়তে থাকে বাস্তুতন্ত্রের বিপদ। এখন আমরা যে অর্থনীতিতে বাস করছি সেটাকে বলা হয় বাজার অর্থনীতি। ফলে শহরের ও প্রসার কেবল যদি বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রের বা সরকারের কোনও ভূমিকা না থাকে তাহলে খোলা বাজারে একটা শহরের বিকাশ সুস্থভাবে হতে পারে না। একটা বিকৃত বিকাশ ঘটবে। সারা দেশের প্রতিটি শহরে এমন উন্নয়নের বিকৃতি ঘটছে। পুঁজির দাপট বাড়ছে। প্রোমোটাররা শহরের পুঁজির দাপট বাড়াতে গাইডলাইন ঠিক করে দিচ্ছে।

বোম্বের ধারাভি বস্তির মানোন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। ৫০ বছর আগে বস্তি যেমন ছিল, এখনও তেমনই রয়েছে। তার তো উন্নতি হওয়া দরকার। কিন্তু বস্তির মানোন্নয়নের ভার যদি আদানির ওপর পড়ে তাহলে সেই উন্নতির গতি কি হবে সেটা ভাবার বিষয়। কলকাতা শহরে এক তৃতীয়াংশ মানুষ নিম্ন আয়ের এবং বস্তিবাসী। ধারণ ক্ষমতার নিরিখে একটা শহরে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকলের স্থান সংকুলান দরকার।

সম্প্রতি আই আই টি খড়গপুরের বিজ্ঞানীরা একটা সমীক্ষা করেছেন নগরায়নের ব্যাপ্তি বোঝার লক্ষ্যে। রাতের আলোয় উপগ্রহ থেকে কলকাতা শহরেরনির্মাণ কাঠামোর চিত্র দেখে শহরের নির্মাণ ঘনত্ব বোঝার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। সেই উপগ্রহ চিত্রে যেখানে আলো আছে সেই জায়গা লোকালয়, আর যে জায়গা অন্ধকার সেটি লোকালয় নয়। সেই উপগ্রহ চিত্র অনুযায়ী ২০০১ সালে শহরের নির্মাণ ক্ষেত্র ছিল ৩১৯ স্কোয়ার কিলোমিটার, যেটা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪৪ স্কোয়ার কিলোমিটার। উপগ্রহ চিত্র অনুযায়ী এখন কংক্রিটের জঙ্গল বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ শতাংশ। এখানেই প্রশ্ন যে শহরের ধারণ ক্ষমতা বলতে যা বোঝায় সেই ধারণ ক্ষমতার নিরিখে কি শহরটা বাড়ছে? খোদ সরকার যদি না জানে কোথায় কতটা বাড়ছে, তাহলে বিপদ অনেক বেড়ে যায়। আরও চিন্তার যে শহরের এই বাড়াটা কি আইন মেনে হচ্ছে? কারণ বহু ক্ষেত্রেই কোনও নিয়ম মেনে এই বাড়িগুলো তৈরি হয় নি। এই শহরে প্রচুর বাড়ি আছে যেগুলো মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হলে বাড়িগুলো ধ্বংস হতে পারে।

একটা শহরকে একটা মাত্র মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। যে উন্নয়নের মডেল নিয়ে আমরা এগোতে চাইছি সেটা একটা বিকৃত মডেল। নগরায়নের সেই বিকৃতিটাই আমাদের আরো বড় বিপদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। আইন-না-মানা লোকেরও একটা বাস্তুতন্ত্র আছে। তারা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আইন যখন ভাঙা শুরু হয় বে-আইনের বাস্তুতন্ত্রটা আরো বেশি শক্তিশালী হয়।

উত্তরকাশীর যোশীমঠে যে পরিমাণ হোটেল, পর্যটন কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল সেটা ধারণ ক্ষমতার বাইরে গিয়ে তৈরি হওয়ার ফলে ভূমি ধসের কবলে পড়ে শেষ হয়ে গেল। এর আগে বহুবার সতর্ক করা হয়েছিল। সাত মাস আগে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, কোনও পার্বত্য শহরে ধারণ ক্ষমতার নিরিখে বাড়িঘর, হোটেল ইত্যাদি তৈরি করতে হবে, তার বাইরে নয়। এইপ্রেক্ষিতেই বোঝা দরকার যে ধারণ ক্ষমতার নিরিখে যেমন পাহাড়ে জনবসতি ঠিক করা প্রয়োজন তেমনটাই প্রয়োজন শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রেও। বিপদের ধরনটা একরকম, সমতলে বিপদের ধরনটা আরেকরকম।

নগরায়নের ফলে অনেক বেশি কংক্রিটে ঢেকে যাচ্ছে শহর। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে, গত ১০ বছরে ভারতের বড় শহরগুলো যেমন বোম্বে, দিল্লী, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ এসব শহরে কমবেশি হলেও সবুজের পরিমাণ বেড়েছে। কিন্তু আমেদাবাদে সবুজায়নের পরিমাণ কমেছে ৪৮ শতাংশ। কলকাতায় কমেছে ৩০ শতাংশ। সবুজায়ন ধ্বংসের মূল কারণ কংক্রিটের নির্মাণ। সবুজ ধ্বংসের পাশাপাশি ধ্বংস হচ্ছে জলাভূমি নির্মাণের দাপটে। এমন জাতীয় বে-আইনি কাজ দশকের পর দশক ধরে হয়ে চলেছে। একে কি উন্নয়ন বলা যায়?

মনে রাখতে হবে যে ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ড আমাদের শহরের কিডনি। এরকম একটা জলাভূমি থাকা এ শহরের খুব বড় সৌভাগ্য। কিন্তু সেই জলাভূমি দখল হয়ে চলেছে প্রকাশ্য দিবালোকে। শহর লাগোয়া নদী গঙ্গার ঢাল পশ্চিমদিকে থাকলেও মূল শহরের ঢাল পূর্ব দিকে। ফলে শহরের জল পাম্প করে গঙ্গায় ফেলতে হয়, স্বাভাবিক গতিতে সেটা হয় না। শহরের জমা জল প্রাকৃতিক নিয়মেই পূর্বদিকে গড়িয়ে যায়। পূর্বদিকে যাওয়ার সময় যত waste water যায় তা স্বাভাবিকভাবে পরিশ্রুত হয় সেই জলাভূমিতে পৌঁছে। অথচ উড়ালপুল, শিল্পাঞ্চল, বাসস্থান তৈরি করার জন্য এগুলো বোজাতে হচ্ছে উন্নয়নের স্বার্থে। দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃত উন্নয়ন হারিয়ে যাচ্ছে এই আশু উন্নয়নের ভ্রান্ত ধারণার ভিড়ে। আইন না থাকার ফলে এই বিকৃতিগুলো ঘটছে তা নয়। সবকিছুর জন্যই আইন আছে। কিন্তু আইনের শাসন না মানার ফলে

আইনটা ভাঙছে। আইনের শাসন যত ভাঙছে শহরের জীবন তত দুর্বিষহ হয়ে বিপদের মধ্যে পড়ছে। ফলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বাসযোগ্য কলকাতা শহরকে দেখবে বলে মনে হয় না। আজ থেকে ৪০ বছর পরে পরিবেশ দূষণের ফলে ডচ্চবিত্ত মানুষেরা শহর কলকাতায় থাকবে না। যেমনটা পশ্চিমে হয়, এখানেও সেটা শুরু হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও বেশি হবে।

তিনশো বছরের শহর কলকাতা। ফলে তাকে রক্ষা করার জন্য যে যত্ন, প্রয়াস, যে বোধবুদ্ধি, যে বিবেচনা সেগুলো যদি প্রয়োগ না করা হয় তাহলে এই শহরের বিপদ ও মৃত্যু অবধারিত। শহর যত বেশি পুরনো হয় তাকে রক্ষা করার জন্য তত বেশি বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা করতে হবে। কলকাতায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ। মুম্বাই ছাড়া ভারতবর্ষের কোথাও এত জনঘনত্ব নেই। কলকাতায় বাস করা এক কোটি লোক মাত্র শহরের ৬ শতাংশ রাস্তা নিয়ে চলছে। কোভিড-এর সময়ে যে দৈহিক দূরত্ব রক্ষা করতে বলা হয়েছিল, এই বিপুল জনঘনত্বের মাঝে সেটা কি সম্ভব? জেলে বন্দী আসামীর জন্য যে জায়গাটুকু বরাদ্দ হয়, কলকাতার শহরে যারা বস্তিতে থাকে তাদের সেটুকু জায়গাও নেই। ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণে অন্যতম বিবেচ্য হল জনঘনত্ব ও যানঘনত্ব। এখন কলকাতার রাস্তায় ৪৫ লাখ মোটর গাড়ি চলে। কিন্তু প্রবল গতিমন্দার শহর হয়ে উঠেছে কলকাতা যানঘনত্বের কারণে। ফলে ধীর গতিতে চলা গাড়িতে দূষণ বাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। দেখা যাচ্ছে যে হারে গাড়ি বাড়ছে সেই তুলনায় রাস্তা বাড়ছে না। এর ফলে যানজট তৈরি হচ্ছে। যানজট হলে গাড়ির গতি কমে আর তার ফলে দূষণ হয়। এর ফলে জনস্বাস্থ্যও বিপন্ন হয়। কলকাতা শহরে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪ শতাংশ অথচ যে সংখ্যা সারা ভারতবর্ষে এর নিরিখে মাত্র ৬ শতাংশ। ধারণ ক্ষমতা ছাপিয়ে শহরের বৃদ্ধির কারণেই এই বিপদ অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

দীপাবলির সময় বাজি পোড়ানো একটা রীতি। কিন্তু এখন প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানেই বাজি পোড়ানো হয়। ফলে বাজির দূষণ হয়ে উঠছে উত্তরোত্তর মাথা ব্যথার বিষয়। এমন প্রেক্ষিতে মানুষের জীবনে দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশের উন্নয়নের স্বার্থে কিছু চালু প্রথা কিংবা রেওয়াজের জলাঞ্জলি ঘটানো প্রয়োজন। একটা সময় বাচ্চা মেয়েরা বিধবা হলে সহমরণে যেতে হত। তা বজায় রাখার জন্য প্রচুর চেষ্টা চলেছিল সে সময়ে। কিন্তু সে প্রথাও আজ পাল্টে গেছে। সামাজিক প্রয়োজনে অনেক সময়ই কিছু রেওয়াজ কিংবা প্রথা পাল্টাতে হয় এবং পাল্টানোর জন্য উদ্যোগ নিতে হয়। পরিবেশ আন্দোলনকর্মীদের ভাবতে হবে কোন কোন রেওয়াজ রক্ষা করা যায় আর কোন কোন রেওয়াজ সিন্দুকে তুলে ফেলতে হবে। সব ক্ষতিকারক রেওয়াজেরই একটা ইতি টানতে হবে এবং তার জন্য জনমত তৈরি করতে হবে।

এখন দেখা যাচ্ছে কলকাতার মতো পুরনো শহরের গড় উচ্চতা বাড়ছে। শহর জুড়ে পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, যা উচ্চতায় বড়। কারণ দৈর্ঘে, প্রস্থে শহরের বাড়ার আর কোনও জায়গা নেই। যেখানে উচ্চতা বাড়ছে, সেখানে বিপদও বাড়ছে। যেখানে বাড়ির উচ্চতা বাড়ার কথা নয়, সেগুলোও বেড়েছে। নিকাশির ক্ষেত্রেও বিপদ বাড়ছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে দেখা যাচ্ছে অতি অল্প সময়ে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে, আবার পাশাপাশি গরমও বাড়ছে। ফলে বর্ষাকালের প্রবল বৃষ্টিপাতের প্রবণতা কমে যাচ্ছে। এখন বছর জুড়েই নিম্ন চাপের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা বছর জুড়েই। ব্রিটিশরা যে নিকাশি ব্যবস্থা করে গেছে তারপরে পৌরনিগম যেটুকু কাজ করেছে তাতে এই বাড়তি বৃষ্টি ধরার ক্ষমতা নেই। বৃষ্টির জল সাধারণভাবেই ভূপৃষ্ঠে চুঁইয়ে যেভাবে মাটির নীচে চলে যেত, সেই পথটাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নগরায়নের প্রভাবে শহর জুড়ে তৈরি হওয়া মাটির ওপরে কংক্রিটের আস্তরণে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টির ধরন পাল্টাচ্ছে। শহর অবরুদ্ধ হচ্ছে বৃষ্টির জমা জলে। অবরুদ্ধ শহরের জল যদি নামতে না পারে তাহলে নানা রকমের জলবাহিত রোগের সম্মুখীন হচ্ছে শহরের মানুষ। শহরে বড় বড় বিল্ডিং হওয়ার ফলে নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকমতো না হওয়ার ফলে জল জমা অবধারিত এবং এই জমা জল যতক্ষণ পর্যন্ত আটকে থাকবে বিভিন্ন জায়গায়, সেক্ষেত্রে রোগজীবাণুর বাসা বাঁধাটা অনিবার্য। এই প্রেক্ষিতে ভাবতে হবে যে কারণে মানুষ শহরে আসছিল শহরের উন্নত জীবনের খোঁজে এখন সেই কারণগুলি কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকছে।

এদেশে উন্নয়নের সাথে পর্যটন এবং পর্যটনের সাথে ধর্ম জুড়ে যাচ্ছে হামেশাই। চারধাম যাত্রায় সড়ক নির্মাণে যে বিপর্যয় ঘটল সেটা তথাকথিত উন্নয়নের ধাক্কাতেই হয়েছে। সরকার উন্নয়নের স্বার্থে নাকি ৫৬ হাজার শতাব্দী প্রাচীন গাছ কেটে হাইওয়ে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল। পাহাড়ে সবুজ ধ্বংস হওয়ার একটা বড় পরিণতি হল পাহাড়ের ঢালের ধস নামছে। যে অঞ্চল আগে ধসপ্রবণ ছিল না সেটাই এখন ধসের কবলে পড়ছে। এইভাবেই বিভিন্ন পাহাড়ে জুড়ে নগরায়ন

ঘটছে। কিন্তু পাহাড়ে যদি নগরায়ন ঘটে তাহলে সমতলের চেয়ে পাহাড়ে বেশি বিপদ ঘটবে। আমাদের প্রতিবেশী সিকিমেও সেই একই বিপদ বেড়ে চলেছে। নগরায়নের চাহিদা পূরণ করতে শিলিগুড়ি থেকে সিকিমের রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে ভারী গাড়ি চলার ফলে সংযোগকারী জাতীয় সড়ক ধসপ্রবণ হয়ে উঠছে।

কিছুদিন আগে উত্তর কাশীর কাছে সুড়ঙ্গ নির্মাণ প্রকল্পে ৪১ জন শ্রমিক সুড়ঙ্গে আটকেছিল টানা সতেরো দিন। সেই বিপর্যয়ে নির্মাণ পরিকল্পনার গলদ এবং নির্মাণকারী সংস্থার দায় ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এমন বিপর্যয় থেকে প্রকৃতির সাথে সংঘাতের শিক্ষা সরকার নিচ্ছে বলে মনে হয় না।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের অনেক ধরনের বিপর্যয় হচ্ছে। প্রতিটি বিপর্যয়ের একটা চরিত্র আছে। অথচ দুর্ভাগ্য যে এদেশের রাজ্যগুলো সেভাবে প্রস্তুতি নেয় না। যেমন রাজস্থানের সরকারকে খরা নিয়ে, তেমনই সিকিমের সরকারকে ভূমিকম্প নিয়ে ভাবতে হবে, বাংলা এবং বিহারের সরকারকে ভাবতে হবে বন্যা নিয়ে। মনে রাখতে হবে যে, বিপর্যয়েরও বিভিন্ন ধরন থাকে। ঘূর্ণিঝড় তৈরি হচ্ছে আন্দামানে, ল্যান্ডফল হচ্ছে উড়িষ্যায়, বৃষ্টি হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে, তারপর বন্যা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। নদীর ধারণ ক্ষমতা না বাড়ালে বন্যা হবে, নদীর পাড় ভাঙবে। নদীকে বাঁচানোর জন্য যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার সেটা সরকার নিচ্ছে কি? সবাই বুঝতে পারছেন যে, আমরা একটা বিপদের মুখে রয়েছি, কিন্তু সে বিপদ থেকে যে বেরোতে হবে সেই উদ্যোগটা কোনও সরকারই নিচ্ছে না। স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ কোথাও নেওয়া হচ্ছে না। ধারণা যেমন উন্নয়ন সম্পর্কে নেই, ধারণা বিপর্যয় সম্পর্কেও নেই। ফলে বিপর্যয় মোকাবিলা করতে গিয়েও কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কিন্তু এই বিপদ থেকে উত্তরণের পথ আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই।

উমা

‘সবই বেদে আছে’ মানে কী?

মীরা নন্দা

[মীরা নন্দা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, মোহালির আমন্ত্রিত অধ্যাপক। তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। বিজ্ঞান আর মানবিকীবিদ্যা, দুই ধারাতেই শিক্ষিত তিনি। শুধু দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী নয়, উত্তআধুনিক ধারার যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান-বিরোধিতার বিরুদ্ধে ভারতে যাঁরা সক্ষম লেখনী চালনা করছেন তাঁদের প্রথম সারিতে রয়েছেন এই বিদুষী বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ। ২০১৬য় প্রকাশিত তাঁর সায়েন্স ইন স্যাফ্রন (গেরুয়া-ছোপানো বিজ্ঞান) একটি সাড়া জাগানো বই। নির্ঝর প্রকাশনী এটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের ভার নিয়েছে। সেই অনুবাদের নির্বাচিত কিছু অংশ তাঁদের অনুমতিক্রমে উৎস মানুষে প্রকাশ করা হবে। বর্তমান সংখ্যায় তার প্রথম কিস্তি।]

‘সবই বেদে আছে’— এই যে-দাবি, এখানে ‘সব’ বলতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জানা যাবতীয় তথ্য ও বস্তুর কথাই বলা হয় (হ্যাঁ, উড়োজাহাজও তার অন্তর্গত)। এ দাবি কিন্তু নতুন নয়। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ কতকাল আগে সেই মধ্য-উনিশ শতকেই এ দাবি ঘোষণা করেছিলেন। ঠিক তেমনি, উনিশ শতকের শেষ দিকে হিন্দু শাস্ত্রর শিক্ষাগুলির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের ‘নিখুঁত সামঞ্জস্য’-র ধারণাটির মূল অনুধাবন করা যায় কেশবচন্দ্র সেনের নববিধানে এবং স্বামী বিবেকানন্দর ভাবনায়। ১৮৯৩ সালে শিকাগোর ধর্মীয় বিশ্ব সংসদ-এ তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারগুলি বেদান্তদর্শনের নিছক ‘প্রতিধ্বনি’ মাত্র।

কাজেই ইদানীং প্রাচীন শাস্ত্রের বইগুলির মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে বার করার যে-হুজুগ উঠেছে সেটা কিন্তু ভারতে আধুনিকতার ইতিহাসেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হিন্দু বিশ্বাস-তন্ত্রর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যে-প্রয়াস তাতে ওটাই হল প্রধান ছাঁচ। স্বামী দয়ানন্দ আর স্বামী বিবেকানন্দর মৃত্যুর পর শতাধিক বছর পেরিয়ে গেছে। আজ এই একুশ শতকে অধিকাংশ ভারতীয়র কাছে হিন্দু বিশ্বাস-তন্ত্রর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এই ধরনটা হয়ে উঠেছে সহজ বুদ্ধির অঙ্গ। দক্ষিণ-বাম নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দল ও মানুষের মধ্যে এর উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে।

তবে যাবতীয় রাজনৈতিক মতের অনুসারীদের মধ্যেই এর প্রকোপ দেখা গেলেও হিন্দু ধর্মকে বৈজ্ঞানিক বৈধতা দেওয়ার উদগ্র আগ্রহকে সচেতন ও সক্রিয়ভাবে মদত দেয় হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এবং তাদের মিত্রবর্গ। বিশ শতকের একেবারে প্রথম কয়েক দশক থেকেই সংগঠিত

দক্ষিণপন্থার সূত্রপাত হয় এবং তখন থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকদের মাথায় এই ধারণা গেঁথে দেওয়া হয় যে বিজ্ঞানের বড়ো বড়ো আবিষ্কারগুলো করেছিলেন প্রাচীন হিন্দু মুনি ঋষিরাই।

সেই কারণেই দেখা যায়, হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা যখনই ক্ষমতায় আসে, সবার আগে তারা নতুন করে ইতিহাস লিখতে শুরু করে আর সেই নতুন ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থান পায় বিজ্ঞানের ইতিহাস।

প্রথম দফায়, অর্থাৎ ১৯৯৮ থেকে ২০০৪-এ, বিজেপি-চালিত এনডিএ সরকার কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফলিত জ্যোতিষ, কর্ম-কাণ্ড (ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান) আর অদ্বৈতবাদী ধাঁচের 'চৈতন্য-বিষয়ক চর্চা'র ডিগ্রি কোর্স চালু করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। এনডিএ ১.০ যেসব কর্মনীতি গ্রহণ করে তার দৌলতে যে কোনো হবু জ্যোতিষী কিংবা হবু পুরোহিতের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা প্রাপ্ত সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা থেকে ডিপ্লোমা পাওয়া সম্ভব।

বিজেপি এখন (২০১৪) আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। এবং আবারও বিজ্ঞানের ইতিহাস সংশোধন করা তাদের শিক্ষা 'সংস্কার' কর্মসূচির একেবারে শীর্ষে রয়েছে। এনডিএ ২.০ এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তাদের প্রচার-বার্তাকে প্রসারিত করে বলতে শুরু করেছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'ভারতই প্রথম'। বিশিষ্ট জনেরা মর্যাদাপূর্ণ, জাতীয় স্তরের সমাবেশে দাবি করতে শুরু করেছেন যে গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র আর শল্যচিকিৎসা থেকে শুরু করে সবকিছুতেই ভারত অগ্রগণ্য—নিউক্লীয় অস্ত্রশস্ত্র, মহাকাশযান ও অন্যান্য স্টার-ট্রেক ধাঁচের প্রযুক্তির তো কথাই নেই। ২০১৪ সালের অক্টোবরে মুম্বাইতে স্যার এইচ এন রিলায়ান্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালের উদ্বোধনী ভাষণে খেলাটা শুরু করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এই ধারায় এর পর এল ২০১৫-র জানুয়ারি মাসের গোড়ায় ১০২তম বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিবিধ অনুষ্ঠান। আরও কিছু কিছু জমকালো অনুষ্ঠানের কর্মসূচিতে রইল প্রাচীন বিজ্ঞান এবং পুরাণকথা থেকে বিনা বিরতিতে আধুনিক বিজ্ঞানে মসৃণ উত্তরণের কথা। যেমন দিল্লিতে ললিত কলা অ্যাকাডেমিতে 'ঋগ্‌বেদ থেকে রোবোটিক্স — সাংস্কৃতির ধারাবাহিকতা' শীর্ষক প্রদর্শনী; যেমন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ আয়োজিত বৈদিক কালানুক্রম বিষয়ক সেমিনার। দুটোই হয়েছিল ২০১৫-র সেপ্টেম্বরে। এইসব বহু-প্রচারিত ঘটনাগুলির পিছনে ছিলেন অজস্র 'শিক্ষা বাঁচাও' কর্মী, যাঁরা চাইলেন এই 'ইতিহাস' যেন বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের অঙ্গ হয়ে ওঠে।

হিন্দু ঋষি-বিজ্ঞানীরাই আধুনিক বিজ্ঞানের গৌরবছটার অধিকারী— এই দাবি পেশ করার মোটের ওপর চারটি ধরন আছে ঃ

১। গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যার দিগ্‌দর্শী আবিষ্কারগুলিতে অগ্রাধিকার প্রাচীন ভারতেরই—এই দাবি পেশ করা। এই বর্গের চিরাচরিত আবিষ্কার হল পিথাগোরাস উপপাদ্য এবং গণিতে বীজগণিত আর শূন্য।

২। পুরাণকথা আর ঐতিহাসিক সাক্ষ্যর মধ্যে প্রভেদ রেখাগুলি মুছে দেওয়া। ওপরে মুম্বাইয়ের হাসপাতালের উদ্বোধনী ভাষণটিতে প্রধানমন্ত্রী এই বাক্‌ছলই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি হস্তিমুণ্ড গণেশের প্রসঙ্গ এনে সেটিকে প্লাস্টিক সার্জারির, এবং মহাভারতের কর্ণর প্রসঙ্গ তুলে সেটিকে 'জিনবিজ্ঞানের'র সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করেন।

৩। বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞানের প্রভেদ রেখাগুলি মুছে দেওয়া, যথা ফলিত জ্যোতিষের মতো অপবিজ্ঞান রূপে চিহ্নিত বিষয়ের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রভেদরেখা।

৪। পদার্থবিজ্ঞানীদের 'শক্তি' কিংবা 'ইথার' প্রমুখ ধারণার ঘাড়ে প্রাণ (অর্থাৎ শ্বাস), প্রকৃতি কিংবা আকাশ (প্রকৃতির 'সূক্ষ্ম' বস্তুগত ধার-স্তর) প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ধারণাগুলি চাপিয়ে দিয়ে উচ্চতর স্তরের এক ধরনের অপবিজ্ঞান নির্মাণ করা। কর্ম-নিয়ন্ত্রিত জন্ম আর পুনর্জন্মর ধারণাকে চাপানো হয় প্রজাতির বিবর্তনতত্ত্বর ঘাড়ে। সত্যিকারের স্নায়ু-নির্মিত কাঠামোগুলির ঘাড়ে চাপানো হয় বিবিধ 'চক্র'কে।

এতসব মানসিক ক্রীড়াকৌশল কেন? কেন 'প্রথম' স্থান দখলের জন্য এত লাফালাফি?

যেসব ব্যাপারকে নিতান্তই স্পষ্ট, এমনকী হাস্যকর বিকৃতি বলে বোঝা যায়, সেগুলোর কার্যকারণ গেরুয়া কোম্পানির আসল উদ্দেশ্যটি কী তা অনুধাবন করতে পারা মাত্রই বোধগম্য হয়ে ওঠে। যে-বিশ্ববীক্ষণটিকে তাঁরা 'বিজ্ঞান'এর ছাপ্পা মেরে প্রচার করবার জন্য ক্রমাগত এমন মরীয়া হয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন সেটির দ্বারা তাঁরা কী অর্জন করতে চাইছেন?

একটা কথা বুঝতে হবে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা কিন্তু ইতিহাস লেখার কাজ করছেন না, যদিও নিজেদের কাজে লাগলে প্রয়োজনমতো তাঁরা ইতিহাসের সাক্ষ্য ব্যবহার করেন। তাঁরা আসলে যা করছেন তা হল একটা মান্য ঐতিহ্য বানিয়ে তোলা, অত্যন্ত অসাধারণ মনে করে যার সামনে আমাদের ভয়ে সম্ভ্রমে নতজানু হতে বলা হবে। একথা ঠিক যে কোনো

ইতিহাসই পুরোপুরি পক্ষপাতমুক্ত আর ভ্রান্তিমুক্ত নয়। কিন্তু ইতিহাসবিদরা আর কিছু না হোক উন্নততর সাক্ষ্যর নিরিখে নিজেদের আখ্যানগুলি শুধরে নিতে চেষ্টা করেন। অপরদিকে ওই পক্ষপাত আর ভুলগুলোই হল এই ঐতিহ্য-নির্মাতাদের উপজীব্য। তাঁদের প্যাঁচালো যুক্তিধারা, তাঁদের বিকল্পনার পক্ষবিস্তার, তাঁদের মানসিক ঘূর্ণিনাচ, এর কোনোটাই সার্কাস নয়; এগুলো সবই হল 'বৈজ্ঞানিক ভারতীয়' কল্পকথা সৃষ্টি-ব্যবসার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।

ডেভিড লাইএন্থাল তাঁর সুপরিচিত *দ্য হেরিটেজ ক্রুসেড অ্যান্ড দ্য স্পয়েল্‌স অব হিস্টরি* (ঐতিহ্য নিয়ে ধর্মযুদ্ধ এবং ইতিহাসের লুঠের মাল) বইতে ইতিহাস আর মান্য ঐতিহ্যের প্রভেদ নিয়ে যা বলেছেন তা ভারতীয় পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক:

মান্য ঐতিহ্য খারাপ ইতিহাস নয়। তা আদপে ইতিহাসই নয়। ...তা অতীত অনুসন্ধান করে না, *অতীতকে নিয়ে উৎসব পালন করে*। সত্যিই কী ঘটেছিল তা জানার প্রয়াস নয়, আজকের প্রয়োজন অনুযায়ী অতীতকে কেটেছেঁটে নিয়ে তার প্রতি ভক্তি নিবেদনের প্রয়াস হল এর বৈশিষ্ট্য।

তাছাড়া

মান্য ঐতিহ্য জিনিসটা ... আসলে *একটা বিশ্বাসের ঘোষণা*। ... মান্য ঐতিহ্য ইতিহাস নয়, এমনকী যখন তা ইতিহাসের নকল করে তখনও নয়। ইতিহাসের সূক্ষ্ম উপাদানগুলিকে তা কাজে লাগায়, ঐতিহাসিক গল্প বলে, কিন্তু সেসব গল্প আর উপাদানগুলিকে কতকগুলি উপকথার মধ্যে বুনে দেয়, যা নিয়ে না-যায় বিশ্লেষণী আলোচনা করা, না চালানো যায় তুলনাত্মক যাচাই-পরীক্ষা।

শুধু কি তাই?

মান্য ঐতিহ্য নিয়ে সমালোচনাত্মক পুনর্মূল্যায়ন চালানো যায় না, কারণ সে তো পাণ্ডিত্যনির্ভর নয়, সে কতকগুলি বিশ্বাস ও মতের তালিকা মাত্র। যাচাইযোগ্য তথ্য নয়, বিশ্বাসনির্ভর আনুগত্যই সেখানে আসল কথা। বিশ্বাসের দায় আর আত্মীয়তার বন্ধন দাবি করে সমালোচনাহীন অনুমোদন, বিরোধী কণ্ঠ সেখানে ব্রাত্য। ... অতীত বিষয়ে পক্ষপাতদুষ্ট পর্ব যে মান্য ঐতিহ্যের এক বেদনাদায়ক পরিণাম তা নয়, ওই গর্বটাই হল এর মূল লক্ষ্য।

(চলবে)

ভাষান্তর — আশীষ লাহিড়ী

ভরত মিলাপ

দীপাবলি সেন

ভরতের উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দিরও যে দেশে আছে, তা আমি সেদিনও জানতাম না। আছে কেরালার তৃসূর জেলার ইরিঞ্জালকুদা শহরের কুডল-মাণিক্যম মন্দির। হৃষীকেশেও আছে। দুটিরই প্রধান উৎসব 'ভরত মিলাপ'। এ ছাড়া প্রত্যেক বছর উত্তর ভারতে দেওয়ালির সময় রামলীলা অনুষ্ঠানেও 'ভরত মিলাপ' পালা বা গীতিনাট্য হয়ে থাকে, টেলিভিশনে তা দেখানোও হয়ে থাকে। কি এই মিলাপ বা মিলন? রাম ও ভরত কতটা মেলবন্ধনে যুক্ত ছিলেন? কতটা এর শুধু ভাবালুতা? বাল্মীকি কি বলেন?

রাজা দশরথ যখন রামকে যুবরাজ করার ব্যাপারে তাঁর মন্ত্রী সভাসদ পাত্র-মিত্র এমনকি প্রজাদেরও সমর্থন নিয়েছিলেন, তখন ভরত শত্রঘ্ন দুজনেই সুদূর কেকয় দেশে। রামকে ঐ সময়েই দশরথ তাঁর ইচ্ছা জানান। রাম প্রশান্তভাবেই সেটা শুনে নিয়ে কৌশল্যাকে তা জানাতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দশরথ তাঁকে বলেন তিনি আগামীকালই কাজটা সেরে ফেলতে চান। ভরত মামাবাড়ি গেছে এটাও তার একটা কারণ। রাম এতে কিন্তু বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন নি, খুশি মনে সীতার কাছে ছুটেছেন। দশরথ খবরটা একদম রাতে, সব কিছু যখন তৈরি, তার আগে কৈকেয়ীকে জানাতে চান নি। রামও তো কৈকেয়ী-মাকে তা জানাতে ছুটে যান নি? কেন যাবেন, দশরথ নিজেই তো তাঁর মনে সতর্কতার বীজ বপন করে দিয়েছেন। ভরত যখন ফিরে এসে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিতে গেলেন, লক্ষ্মণের কথা দিব্যি মেনে নিয়ে রাম কুটীরের মধ্যে ঢুকে থাকলেন। এগিয়ে এসে আবাহন করার মতো আস্থাটুকুও দেখালেন না। বনবাসের প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত থাকলেও, ভরত যখন তাঁর সংকল্পটি ঘোষণা করলেন, 'তথাস্তু' বলতে তাঁর দেরি লাগল না। অতবড় আত্মবিলোপ ও কৃচ্ছসাধন থেকে তাঁকে নিবৃত্ত হতে একটি অনুরোধও করলেন না। ইচ্ছে করলে ভরত শত্রুঘ্নকে কি তিনি তাঁর কথা শুনতে রাজি করাতে পারতেন না? ভায়ের বৌদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম!

হাতি পিঠে খড়ম তুলে ভরত চলে গেলেন, রাজধানী

থেকে বনে না হোক গ্রামে নির্বাসন নিলেন শত্রুঘ্ন বেচারা সহ। রাম কিন্তু এতেও স্বস্তি পান নি। ভরত যে সৈন্যসামন্ত নিয়ে চলে এসেছিল, তার হাতি ঘোড়া বনের মধ্যে নোংরা করে গেছে, এসব তাঁর অসহ্য লাগতে লাগল। তিনি বনের আরো গভীরে চলে গেলেন। ভরতের আওতার আরো বাইরে।

বিরাট নামে রাক্ষস এল, সীতাকে তুলে নিয়ে দৌড় দিল। আশ্চর্য, প্রথম প্রতিক্রিয়ায় রাম ফেললেন কেঁদে। কৈকেয়ীর মনোবাসনা এতদিনে পূর্ণ হল, এই বলে। লক্ষ্মণের কথায় পরমুহূর্তে ধনুর্বাণ নিয়ে রাক্ষসের পেছনে ধাওয়া করলেও, সদ্য-তরুণ রামের পুঞ্জীভূত চেপে-রাখা অনুভূতির একটা আভাস বাল্মীকির রচনায় রয়ে গেছে। ভরতকে তিনি বলে দিয়েছিলেন ঠিকই, কৈকেয়ীর প্রতি কোনো দুর্ব্যবহার না করতে, কিন্তু তাঁর নিজের মনেই এ দুজনের প্রতি একটা অবিশ্বাস তাঁর ছিল। 'মিলাপ' ঠিক হয় নি।

হনুমান সীতার সঙ্গে দেখা করলে, সীতা সহজভাবেই শুধিয়েছিলেন, রাম যে আমায় উদ্ধার করতে আসছেন, সঙ্গে ভরতের অর্থাৎ অযোধ্যার সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছেন তো? স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু রাম ঐ লাইনেই যান নি। কত প্রতীক্ষা করেছেন ও (সীতাকে) করিয়েছেন কিন্তু কোনো পাখি-টাখি কিম্বা বাঁদর দিয়ে ভরতকে খবর পাঠান নি। সময়াভাবে? কিন্তু বর্ষায় কিষ্কিন্ধ্যার গুহায় বসে যে সময় নষ্ট হল তার মধ্যেও তো খবর গিয়ে ফৌজ এসে যেতে পারত? তবে কি রাম তাঁর কীর্তির সব গৌরবটা একা নিতে চেয়েছিলেন? হয়ে থাকতে পারে। আরো মনে হয়, তাঁর মনে কাজ করেছিল ভরতের প্রতি তাঁর একটা অনাস্থা বা সন্দেহ, যা দশরথ রোপন করে গিয়েছিলেন। তাই ফেরার সময় সহজ সরলভাবে তিনি ভরতের কাছে চলে যেতে পারেন নি। ইতিমধ্যে তাঁর মনে রাজ্যলিপ্সা জেগেছে কিনা, পাদুকা-টাদুকা যাই হোক, অযোধ্যায় সে ঢুকতে দেবে কি না, ইত্যাদি জেনে নিতে হনুমানকে চর পাঠিয়েছেন। ভরত দু'হাত বাড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছেন। রাজ্যে সসম্মানে ও সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েও রাম কিন্তু যুবরাজ হবার 'ফার্স্ট অফার'টা ভরতকে দেন নি। লক্ষ্মণকে দিয়েছিলেন। যদিও ১৪ বছর ধরে ভরত (শত্রুঘ্ন) ঐ রাজকার্য দেখে এসেছেন, বিদ্রোহ দূরে থাক, কোনো অভিযোগও ওঠে নি।

লক্ষ্মণ ঐ পদটি গ্রহণ না করলে তবেই সেটা ভরতের কাছে আসে। ওটা যৌবরাজ্য মাত্র। সেই যৌবরাজ্য যার জন্য এত! ইচ্ছা করলে রাম কি ভরতকে অর্ধ রাজ্য প্রদান করে দিতে পারতেন না? অন্তত উত্তর কোশল বা অন্য কোনো কাছাকাছি জায়গার সর্বেসর্বা? না, ভরতকে তিনি চোখেচোখে রাখতে চেয়েছেন অধঃস্তন কর্মচারি হিসেবে। হয়ত সেজন্যই ঐ জুটিটি ভেঙে ভরতের ডানহাত শত্রুঘ্নকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যমুনার পারে মধুরা (মথুরা)য়। শত্রঘ্ন একাধিকবার ফিরতে চাইলেও রাম উৎসাহ দেন নি। একদম শেষে যখন পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা করছেন তখন রাম কিছুটা ভরতের পরামর্শ নিয়েছিলেন। আর বৃদ্ধ কেকয়রাজ যুধাজিৎ-এর কথায়, দুই ভাইপোকে দিয়ে গিয়েছিলেন তাদেরই জয় করা কেকয়ের কাছে দুটি প্রদেশ। অযোধ্যার ধারেকাছে যা নয়। আর সেই শেষের সেদিন ... বলেছিলেন, এইবার তুমি অযোধ্যার রাজা হতে পার। ভরত বরাবরের মতো বলেছিলেন, রামকে ছেড়ে তিনি স্বর্গের সিংহাসনও চান না।

বরাবরের মতো রাম আর পীড়াপীড়ি করেন নি! সবার সলিলসমাধি হলে অযোধ্যার কি দশা হয়েছিল তার বর্ণনা কালিদাস দিয়েছেন।

কতশত বছর ধরে রামলীলা হয়ে চলেছে, রামমন্দিরও আজ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। তবু, মানুষ রামকে বুঝবার চেষ্টা কতটা হয়েছে? ভরত একমাত্রিক চরিত্র ছিলেন, তিনি আত্মবিলোপ করেছিলেন, রাম বহুমাত্রিক ছিলেন ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' রূপে। মৌলিক তফাৎ ছিল তাঁদের, বরাবর ছিল। ওকে মিলাপ বলা চলে না।

উমা

বইমেলায় উৎস মানুষ-এর স্টল নম্বরঃ ৬৪৯

(লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নের পাশে।)

অকাল যৌবন

শংকর ঘটক

মহাভারতের উনচল্লিশ সংখ্যক অধ্যায়ে উল্লেখিত যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংলাপে যক্ষ প্রশ্ন করেছিলেন, 'বিশ্বের সবচাইতে আশ্চর্যজনক ভাবনাটি কি'। যুধিষ্ঠিরের জবাব, 'নশ্বর মানুষ ভাবে যে সে অবিনশ্বর'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। আর সবচাইতে ভাল হয় যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি, যৌবনকালটি ধরে রাখা যায়। এই স্বপ্ন নিয়ে অজস্র গল্প-উপন্যাস-নাটক-সিনেমা হয়েছে। কল্পনার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে কল্পনার জগতে। এই অলীক বিষয়টিকে পুঁজি করে প্রতারণার পুঁজি নির্মাণের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে এই শতকে। বিজ্ঞানের তকমা লাগিয়ে অপবিজ্ঞানের এই নব প্রচেষ্টা আতঙ্কের। ক্ষুদ্র ভূমিকা সদৃশ বর্তমান নিবন্ধটি পেশ করা যাক আজকাল ডিজিটালে সদ্য প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন দিয়ে।

'৮০-তে আসিও না'। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত এই ছবি হয়েছিল সুপারহিট। 'যৌবন' পুকুরে একবার ডুব দিলেই মৃত্যুশয্যায় চলে যাওয়া মানুষ হয়ে উঠবে ছোকরা। কিন্তু সেই ছবি তো কল্পনার জগৎ। কিন্তু বাস্তবেও যে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে তা কে জানত।

বুড়োদের ছোকরা বানিয়ে দেওয়ার চমৎকার ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের কানপুরের দম্পতি রাজীবকুমার দুবে ও রেশমি। শহরের কিদওয়াই নগর এলাকায় রীতিমতো খুলে ফেলেছিলেন থেরাপি সেন্টার। প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়েছিলেন বহু বৃদ্ধ। দম্পতির প্রতিশ্রুতি ছিল ইজরায়েল থেকে আনা বিশেষ টাইম মেশিনের মাধ্যমে ৬০ বছরের বৃদ্ধ হয়ে যাবে ২৫ বছরের যুবক। এইভাবে হাতিয়ে নিয়েছিলেন প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। পুলিশে অভিযোগ জমা হতেই বিদেশে গা ঢাকা দিয়েছেন ওই দম্পতি।

ওই দম্পতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বিশেষ অক্সিজেন থেরাপির মাধ্যমে এই অসাধ্যসাধন করা হবে। কিদওয়াই নগর এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন ওই দম্পতি। যৌবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্যাকেজ সিস্টেম চালু করেছিলেন ওই দম্পতি। যেমন ১০টা সেশনের প্রতি সেশনের জন্য খরচ পড়বে ৬ হাজার টাকা। আবার তিন বছরের জন্য প্রতি বছর ৯০ হাজার টাকা করে দিলে মিলবে অফুরন্ত যৌবন। দম্পতি বলে বেড়াতেন বায়ু দূষণের জন্য মানুষ দ্রুত বৃদ্ধ হয়ে পড়ছে। কিন্তু এই অক্সিজেন থেরাপির মাধ্যমে মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই মিলবে যৌবন প্রাপ্তি।

পুলিশে প্রথম অভিযোগ জানান রেনু সিং নামে এক ভুক্তভোগী। তাঁর অভিযোগ ছিল, তিনি এই প্রতারণার পাল্লায় ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা হারিয়েছেন। এভাবে অনেক মানুষই প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন বলে তিনি অভিযোগ জানান। প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা প্রতারকরা হাতিয়েছেন বলে পুলিশে অভিযোগ জমা পড়ে।

এদিকে পুলিশে অভিযোগ জমা পড়তেই দম্পতি বেপাত্তা। পুলিশের অনুমান স্বামী-স্ত্রী টাকা হাতিয়ে বিদেশে গা ঢাকা দিয়েছেন।

এটি খুব অবাক করা ঘটনা নয়। এই জাতের প্রতারণা, যেখানে বিজ্ঞানের জালি শিলমোহর লাগিয়ে জাঁকাল ব্যবসা ফাঁদা যায়, দীর্ঘকাল ধরে চলছে এবং আশঙ্কা হয়, আরো দীর্ঘকাল ধরে চলবে। আশঙ্কাটি অমূলক নয়, এর একটি বিশেষ কারণও আছে। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নির্বাচিত উদ্ভাবন অথবা সন্ধানকে বিকৃত অনুবন্ধে প্রতারণার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ জানা ছিল। উদাহরণ বহু, যেমন, ম্যাগনেটোথেরাপি (বুকে চুম্বক) অথবা ইলেক্ট্রোথেরাপি (তামার বালা)। সমস্যা হল এর পেছনে জবরদস্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, ভাসাভাসা গোঁজামিল দেওয়া কিছু কথা বলা যায় মাত্র। যদি পর্যাপ্ত গবেষণার ফলশ্রুতি রূপে দেখান যেত কিছু, বিশ্বাসযোগ্য বিজ্ঞানের ভাষায় উপস্থাপিত করা যেত, তাহলে প্রতারণার ব্যবসাটাও জমত ভাল। তেমনি একটি কাহিনী এবার বলা যাক।

২

বছর পনের-বিশ আগে জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের কথা জানালেন। চামড়ার কোষের ওপর চারটি প্রোটিন যোগ করে দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করলেন। তারপর পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন কয়েকটি কোষের অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে। সেই কোষগুলো আবার নবীন কোষে রূপান্তরিত হয়েছে। 'একদিন' বয়সের ভ্রূণের স্টেমসেলের মতো হয়ে গেছে বৃদ্ধ সেই কোষগুলো। মনে হচ্ছে যেন জীবনযাত্রার সদ্যই সূত্রপাত হল ওদের। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে অন্তত পরীক্ষাগারের ক্ষুদ্রাকার বাটিতে (petri dish) ১০১ বৎসর বয়সের ব্যক্তির চামড়ার

কোষ রেখে নিয়মমাফিক প্রক্রিয়াকরণ করলে এমন কোষ পাওয়া সম্ভব যা কার্যত সদ্যোজাত। জাপানের বিজ্ঞানী সিনিয়া ইয়ামানাকা (Shinya Yamanaka) ২০০৬ সালে চারটি বিশেষ প্রোটিন চিহ্নিত করেন, যেগুলি সাধারণ কোষকে কার্যকরী স্টেমসেলে পরিবর্তিত করতে সক্ষম। কাজটির জন্য ২০১২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

এরপর শুরু হয় তথাকথিত সেলুলার রিপ্রোগামিং নিয়ে গবেষণা। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করার পরে বেশ কিছু বায়োটেক কোম্পানি আর গবেষণা কেন্দ্রের উত্তেজক ইঙ্গিত 'বয়সকে উল্টোপথে হাঁটানো সম্ভব।'। গবেষণাগারের প্রাণীদের ওপর নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার পরে বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ 'প্রক্রিয়া শেষে এমনটা বলা যাচ্ছে যে প্রাণীদের, অন্তত ওদের কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তারুণ্যের প্রকাশ ঘটছে'। এই বক্তব্য তারস্বরে প্রচারে মুখ্য ভূমিকা নিলেন রিচার্ড ক্লাউসনার নামক এক বিজ্ঞানী।

৩০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে নির্মিত হয় 'অল্টোস ল্যাব' নামে একটি গবেষণাগার যার প্রধান বিজ্ঞানীর কার্যভার গ্রহণ করেন রিচার্ড ক্লাউসনার। গবেষণাগারের মুখ্য গবেষণার বিষয় 'পুনর্যৌবনকার্যক্রম'।

এই কার্যক্রমে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। এখনো হচ্ছে। কিন্তু এর ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউই খুব আশাবাদী নন। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বার্ধক্য গবেষণায়'রত ডেভিড সিনক্লেয়ার বললেন, 'মানুষকে অনেক বেশিদিন বাঁচতে সহায়তা করবে এই প্রযুক্তি। সেদিন আর দূরে নয় যখন ডাক্তারের কাছে গিয়ে প্রেশক্রিপশন লিখিয়ে মানুষ ট্যাবলেট কিনে আনবে বয়সটা বছর দশেক কমাবার জন্য'। বললেন,'আমি এমন কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না যা মানুষের ২০০ বছর বাঁচার অন্তরায়'।

এই বিষয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের সন্দেহ আর উপহাস কার্যত উপেক্ষা করে আরো কয়েক হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ হয়েছে।

২০২২-এর ২৫ অক্টোবর, অ্যানটোনিও রিগালাডো এমআইটি টেকনোলজি রিভিউ পত্রিকায় একটি সাড়া জাগানো প্রবন্ধ লেখেন, 'how scientists want to make you young again'. বিষয়বস্তুটি অবশ্যই চমকে দেবার মতো। আমরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণ গল্পটি জানি। বাবা চাইছেন বালক হতে, ছেলে চাইছে বাবার মতো স্বাধীন হতে। তাদের নিজ নিজ মনস্কামনা পূর্ণ হল। গুরুদেব লিখছেন : সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল যে, 'আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।'

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, 'আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালোরকম পড়াশুনো কিছু হল না। আহা, আমার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই, তা হলে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশুনো করে নিই।'

ইচ্ছা-ঠাকরুণ সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিয়ে পারিয়া ভাবিলেন, 'আচ্ছা ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।' এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।' ছেলেকে গিয়া বলিলেন, 'কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।' শুনিয়া দুইজনে ভারি খুশি হইয়া উঠিলেন।

হ্যাঁ, ইচ্ছা-ঠাকরুণ এক লহমায় বয়স পাল্টে দিলেন। বিজ্ঞান বলছে, এটা নিছক গল্প-কথা নয়, বিজ্ঞান সত্যিই পারে বয়স পাল্টে দিতে। আমরা সবাই জানি, ডলি নামের ভেড়াটির কথা। ৯০-এর দশকে স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা একটি পূর্ণবয়স্ক ভেড়ার স্টেমসেলকে শৈশবত্ব দান করেছিলেন ডলির জন্ম দিয়ে। এটাকে বলে ক্লোনিং। এই পদ্ধতিতে বৃদ্ধ কোষ ব্যবহার করে পৃথক একটি শিশুর জন্ম হচ্ছে। কিন্তু বৃদ্ধ দেহের বৃদ্ধ কোষকে যদি তারুণ্যে পাল্টানো যায় তবে বৃদ্ধ নিজেই ফিরে যাবে তারুণ্যে। বছর পনের আগে জাপানের কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখিয়েছেন এটা সম্ভব। পরীক্ষাগারের সীমিত পরিসরে কিছু বৃদ্ধ কোষের ওপর পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এই সম্ভাবনার কথাটুকুই বলেছিলেন মাত্র। বর্তমান বিশ্বে বেশ কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই সম্ভাবনার কথাটুকুকে মূলধন করে এই জাতের গবেষণায় বিপুল পরিমাণে লগ্নি করতে উৎসাহ দেখালেন। গবেষণার সাইন বোর্ড টাঙিয়ে শুরু হল প্রতারণার ব্যবসা। রিচার্ড ক্লাউসনার ঝাঁপিয়ে পড়লেন যৌবন বেচার ব্যবসায়ে। লক্ষ-কোটি ডলারের জালিয়াতি ব্যবসা। 'ওষুধ খান, ফেলে আসা যৌবন ফিরে পান। এই হচ্ছে শ্লোগান।'

অ্যান্টোনিও রিগালাডো বলছেন, 'ওদের উদ্দীপনা দেখে মনে হচ্ছে বিজ্ঞান নয়, ওরা তৈরি ট্যাবলেট নিয়ে, যা খেলেই বয়স পিছন পানে হাঁটা দেবে'।

পাকা চুল কালো করা, কুঁচকানো চামড়া টান টান করা ইত্যাদির পরে আসছে ট্যাবলেট খেয়ে যৌবন ধরে রাখা কিংবা যৌবনটাই ফিরে পাওয়া। হাজার হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ মোটেই মাঠে মারা যাবে না। **উমা**

রূপকথা-কমিক্স-কার্টুন ... মনের দুয়ার খুলে

অরুণালোক ভট্টাচার্য্য

জন্মের ঠিক পরেই মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক নিয়মে প্রায় একই রকম। কিন্তু বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য চেহারার পরিবর্তন তো হয়েইছে, কিন্তু বোধহয় বেশি পরিবর্তিত হয়েছে তার মনন। সেই মননের পরিবর্তনই মানুষকে তৈরি করেছে এক অনন্য জীব। নিরন্তর সেই মনন-পরিবর্তনে বিভিন্ন রকম বাহ্যিক স্টিমুলাসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রূপকথা, কার্টুন বা কমিক্স—সবই সেই বাহ্যিক স্টিমুলাসের বিভিন্ন রূপমাত্র।

হয়ত বা সৃষ্টির সেই আদিম যুগ থেকেই শিশুরা তাদের অগ্রজদের মুখ থেকে শুনে আসছে আপাত কল্পনার কত কাহিনী। তারই একটিকে আমরা জানি বা বুঝি রূপকথা হিসাবে। সেই কাহিনীর নির্যাস শ্রবনেন্দ্রিয় মারফৎ শিশু-মগজের রন্ধ্রকোষের হার্ডডিস্কে প্রোথিত হয়ে যায়। সেই জমা হওয়া ডেটা শিশুর আরেক বিমূর্ত রূপকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বিমূর্ত সেই রূপটি হল মনন। যা নাকি ভবিষ্যতের নাগরিককে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার দিকনির্দেশক। আসলে রূপকথার গল্পগুলি মৌখিকভাবে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। লিখিত উপাদান ছিল অপ্রতুল। এই কারণে তাদের বিকাশের ইতিহাস অপরিহার্যভাবেই অস্পষ্ট। রূপকথা তো আদতে একটি ছোট গল্পের ছাঁচে ঢালা, মূলত লোককথা ও কাল্পনিক চরিত্রের। যেমন : বামন, ড্রাগন, পরী, দৈত্য, রাক্ষস, খোক্কস, গবলিন, মৎস্যকন্যা, কাল্পনিক ঘোড়া বা ডাইনি, জাদু বা জাদুমন্ত্র ইত্যাদির সংমিশ্রণ।

এটা সত্য যে শিশুরা, বিশেষ করে অল্পবয়সি যারা লোককাহিনী শুনতে বা পড়তে পছন্দ করে। শিশু বয়সটি হল আহরণের বয়স। সে তার চারপাশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা পায়, সেটিকেই নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করে। রূপকথা হল সেরকমই একটা মাধ্যম, যার সাহায্যে ছোটরা মানবজীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন রূপগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত লোককথা আস্তে আস্তে রূপকথায় পরিবর্তিত। বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে যাত্রা শুরু করলেও, রূপকথা কিন্তু ধীরে ধীরে শিশুমননের বীজতলার বপন করা চারা গাছের ভূমিকা নেয়। রূপকথার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে শিশুরা বুঝতে শেখে ভালোমন্দের ফারাক। তাদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে মানুষের ব্যবহার, আচার-আচরণকে অন্বেষণ করে সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। সেইমতো তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণবিধির একটা ব্লুপ্রিন্ট নিজেদের মননে আস্তে আস্তে সংরক্ষিত হয়ে যায়। রূপকথার বিভিন্ন চরিত্র, তাদের আচার-ব্যবহার, তাদের মিথষ্ক্রিয়া, তাদের আচরণের চূড়ান্ত ফলাফল, সবই শিশুমন আহরণ করতে থাকে। চিন্তন প্রক্রিয়া ভালো-মন্দের ফারাক করতে শেখে। কাল্পনিক চরিত্রগুলি শিশুর কল্পনাশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

আইনস্টাইন সাধে বলেছেন— 'সন্তানকে বুদ্ধিমান করে গড়ে তুলতে হলে, রূপকথার গপ্পো পড়াও। তাকে আরও বুদ্ধিমান করতে হলে, আরও রূপকথা পড়াতে হবে'।

বাঙলা ভাষায় রচিত একমেবদ্বিতীয়ম রূপকথার বই-এর কথা ভাবলে প্রথমেই স্মরণে আসে *ঠাকুরমার ঝুলি*র কথা। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত, ১৯০৭ সালে প্রকাশিত সেই কালজয়ী বই-এর মুখবন্ধে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ নিশ্চয়ই বাহুল্য হবে না— '*পালা পার্বণ যাত্রা গান কথকতা এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মতো শুকাইয়া আসাতে, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্ক লোকেদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে। তাহার পরে দেশের শিশুরাও কোন পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল। তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এমন নীরব কেন? তাহাদের পড়াঘরের কেরোসিন-দীপ টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায় তাহাতে কেবল বিলাতী বানান—বহির বিভীষিকা। মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে! অতএব বাঙালির ছেলে যখন রূপকথা শোনে কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাঙলার রসে রসাইয়া লয়*'।

গল্প বলার উদ্দেশ্যে মানুষের আঁকা ছবি প্রথম ব্যবহৃত হয়

প্রাচীন গুহাচিত্রে। সময়ের হিসাবে যা প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে। অনুক্রমিক শিল্প বা সিকোয়েন্সিয়াল আর্টের উদাহরণ মেলে মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক, গ্রীক ফ্রিজ (friez) বা দেওয়াল চিত্র, রোমের ট্রাজানের কলাম (১১০ খ্রিস্টাব্দে উৎসর্গীকৃত), মায়া লিপি, মধ্যযুগীয় ট্যাপেস্ট্রি যেমন বায়উইক্স ট্যাপেস্ট্রি এবং সচিত্র খ্রিস্টান পাণ্ডুলিপি।

কমিক্স এবং অধুনা গ্রাফিক উপন্যাসগুলি, পাঠ্যকল্পের একটি অভূতপূর্ব মাধ্যম হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। যা পরবর্তীতে বিনোদনের সীমা অতিক্রম করে, শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক বিকাশের একটি অমূল্য হাতিয়ার হয়ে ওঠে। কমিক্স এবং গ্রাফিক নভেলের শিক্ষাগত সম্ভাবনাকে অবহেলা করা অসম্ভব। এই চাক্ষুষ আখ্যানগুলি সাক্ষরতা বৃদ্ধি থেকে জটিল ধারণাকে সরলীকরণের মাধ্যমে আত্মস্থ করা পর্যন্ত শিশুমনকে সাহায্য করে। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদরা প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির পরিপূরক হিসাবে কমিক্সকে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করেছেন। অধিকন্তু, কমিক্সের পাতায় পাতায় চিত্রিত কাহিনী ও বৈচিত্র্য, শিশুর বিশ্বরূপ দর্শনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন শিশুরা বিভিন্ন দেশের পটভূমি এবং সংস্কৃতির আবহে চরিত্রগুলির মুখোমুখি হয়, তখন তারা মনুষ্যজাতির বৈচিত্র্য এবং বাহুল্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এই এক্সপোজারটি শিশুমনে যে শুধুই সহানুভূতি এবং সহনশীলতার জন্ম দেয় তা নয়, বরং অন্যদের সম্মান করতেও শেখায়। কমিক্স এবং গ্রাফিক উপন্যাসের অপার সৃজনশীলতা পাঠকদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে, অচেনা এবং অজানা বিশ্বের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেরিয়ে এবং তাদের এক মনোমুগ্ধকর গল্পের চুম্বকে আকর্ষিত করে রাখে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, টিনটিনের কাহিনীর পটভূমি, যা বিভিন্ন দেশের অধিবাসী এবং মানুষজনের মধ্যে আবর্তিত হয়, বা ক্যাপ্টেন হ্যাডক, কুট্টুস বা প্রোফেসর ক্যালকুলাসের সূক্ষ্ম হিউমার, অরণ্যদেব বা টারজানের সাহসিকতা, নীতিবোধ—আরও অজস্র উদাহরণ আছে, যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় শিশুর সৃজনশীলতাকে জাগরূক করার অন্তহীন সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। তদুপরি, কমিক্স এবং গ্রাফিক উপন্যাসের চরিত্রগুলির মানসিক আবেগ, পাঠক শিশুদের মনে সহানুভূতি (sympathy) এবং সহমর্মিতার (empathy) ভাব বিস্তার করতে সাহায্য করে।

কমিক্স পরবর্তী জঁরে এল কার্টুনচিত্র। কার্টুনচিত্র আভিধানিকভাবে মজার বা স্যাটায়ারিকাল স্থিরচিত্র হলেও অন্যতরভাবে এটিকে আমরা চলমান ছবির সমাহার বলেই মনে করি। কার্টুনের মধ্যে দিয়ে কমিক্সের চরিত্রগুলি আরও গতিসম্পন্ন হল। দেখা গেছে যে কার্টুন চরিত্রগুলির প্রতি শিশুদের আকর্ষণ তাদের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন দিককে উন্নত করে, যেমন সৃজনশীলতা, শব্দভাণ্ডার, লেখার দক্ষতা, ভাষা এবং বোধ ক্ষমতা। কার্টুনের মধ্যে দিয়ে শিশুদের অন্তত দুটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হয়। ছবি এবং রঙের বাহার চোখের মাধ্যমে, রকমারি শব্দ কর্ণকুহরে, এবং গতি বা চলমানতা স্থানিক বা অবস্থানিক (spatial) বোধকে জাগরূক করে। কার্টুনের উপকারিতা সম্বন্ধে বলতে গেলে গেলে প্রথমে বলতে হয়, কার্টুনের চরিত্রগুলি শিশুমনকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে তাদের সৃজনশীলতাকে উদ্দীপিত করে। কার্টুনে চিত্রিত চরিত্রগুলির চলন-বলন, কীর্তিকলাপ শিশুদেরকে নিজের মতো করে গল্প-ভাবনার অন্বেষণে সাহায্য ও উৎসাহিত করে। ছোটবেলা থেকেই একটি সৃজনশীল মন গড়ে ওঠে। এই কল্পনাপ্রসূত কাহিনীর মাধ্যমে মনুষ্যজীবনের জটিলতা ও তার সমাধান সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা দানা বাঁধতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত, কার্টুনগুলির বিভিন্ন চরিত্রের বাচন এবং শব্দচয়ন প্রায়শই নবীন দর্শকদের কাছে নতুন অভিব্যক্তি এবং ধারণার দ্যোতক, যার ফলে হয়ত সেইসব শব্দভাণ্ডার শিশুর কথ্য ভাষাতেও প্রকাশিত হয়। আকর্ষণীয় এবং বিনোদনমূলক বিষয়বস্তুর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার এক্সপোজার শিশুদের কার্যকরী আরও নতুন শব্দ ও উপলব্ধি আহরণ করতে সাহায্য করে। উপরন্তু, যে পরিস্থিতিতে এই শব্দগুলি কার্টুন-চিত্রে ব্যবহৃত হয়, তা শিশুদের পরিস্থিতি বিশেষে ভাষার উপলব্ধি এবং প্রয়োগে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, কার্টুন চরিত্রের ভিজ্যুয়াল এবং বর্ণনামূলক উপাদান শিশুদের লেখনশৈলী দক্ষতার উন্নতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে পারে। চরিত্রগুলির পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে শিশুরা তাদের মধ্যেকার শিল্পীসত্তাকে আবিষ্কার করতে শেখে। তাদের গল্প বলার ক্ষমতা এবং লিখিত অভিব্যক্তির দক্ষতা আরও ধারালো হয়। এই প্রক্রিয়াটি তাদের চিন্তাভাবনাকে সুসংহত করতে এবং লেখার মাধ্যমে তাকে কার্যকর করতে উৎসাহিত করে। মোটের উপর কার্টুন-চিত্র এমন একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে, যা একটি শিশুর সার্বিক সৃজনশীলতা, শব্দভাণ্ডার আহরণ, লেখনশৈলী,

ভাষা-জ্ঞান এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ দক্ষতার সামগ্রিক বিকাশে অবদান রাখে এবং শিশুটির আজীবন শিক্ষা এবং বৌদ্ধিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে।

রূপকথা বা কমিক্স বা কার্টুন যেমন শিশুদের মনের জানলার কপাট খুলতে সাহায্য করে, ঠিক সেরকমই এই তিনটি মাধ্যমে যদি শিশুরা মাত্রাতিরিক্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তাহলে সেটি নেশার মতোই ক্ষতিকারক। এখানে অভিভাবকদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স (এএপি)-এর বিশেষজ্ঞদের মতে, যে শিশুরা হিংস্রতায় ভরা কার্টুন দেখে, তারা স্বভাবগতভাবে নার্ভাস, আক্রমণাত্মক, অধৈর্য এবং অবাধ্য হয়। কল্পকথার চরিত্ররা প্রায়শই অতিমানবীয় কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। কিছুটা হলেও তাদের এই নায়কোচিত আচার-ব্যবহার শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। নিজেদের অজান্তেই সেইসব চরিত্রকে রোল মডেল বানিয়ে, তাদের অনুকরণ করতে শুরু করে। যেটির পরিণতি ভয়ঙ্কর। বইয়ে রূপকথা বা কমিক্স পড়ার মধ্যে আপাতভাবে কোনও সমস্যা না থাকলেও টিভি বা অন্যান্য মাধ্যমে কার্টুন দেখলে শরীরগত কিছু সমস্যা শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন টেলিভিশনের ঝিরঝিরে আলো মৃগী রোগীদের খিঁচুনির কারণ হতে পারে। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে জাপানে ৬৫৩ জন শিশু মৃগীরোগের উপসর্গের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। হঠাৎ করে এই সংখ্যাধিক্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে পোকেমন কার্টুনের ৩৮তম পর্বে লাল এবং নীল আলোর ঝলকানিতেই খিঁচুনিরএই বাড়বাড়ন্ত। সেই এপিসোডটি বিশ্বের আর কোথাও কখনও পুনঃপ্রচারিত হয় নি, কারণ এটি জাপান সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। এ ছাড়াও টিভিতে আসক্তি শিশুদের চোখের সমস্যা, পিঠের ব্যথা বা মেদবৃদ্ধির মতো আনুষঙ্গিক সমস্যার সূত্রপাত ঘটায়। সেইখানেই অভিভাবকদের ভূমিকা হয়ে ওঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ন্ত্রিত এবং পরিমিত রূপকথা এবং কমিক্স পঠন এবং কার্টুন দেখার মধ্যে শিশুমনের বীজতলায় আনন্দ ও চরিত্রগঠনের যে চারাগাছগুলি রোপিত হয়, সেগুলিই প্রাপ্ত বয়সে মহীরূহের আকার ধারণ করে, মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে সুস্থ সমাজ তথা পৃথিবী গড়তে।

তথ্যসূত্র:

ঠাকুরমার ঝুলি - দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

Therapeutic and developmental benefits of fairy tales in early childhood: A mini-review
Myrto Patagia Bakaraki, Theofanis Dourbois&Alexandra Kosiva
Brazilian Journal of Science, 3(8), 19-23, 2024. ISSN: 2764-3417

কমিক্সের ইতিহাস - উইকিপিডিয়া

Comics and Graphic Novels:Impact on Children Through History- Siby Shaji- https://informationmatters.org/2023/08/comics-and-graphic-novels-impact-on-children-through-history/

The cartoon character syndrome: Navigating the impact on childhood developmentin the digital age- M Manoj Prithviraj, Mohd R. Alam, and Nisha Devi- Indian J Psychiatry. 2024 May; 66(5):

উমা

গ্রাহকদের প্রতি

যাঁদের গ্রাহক চাঁদা ডিসেম্বর ২০২৪-এ শেষ হয়েছে তাঁদের কাছে অনুরোধ গ্রাহকপদ নবীকরণ করে নিন।

সরকারি ডাক ব্যবস্থায় বুক পোস্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই ২০২৫ থেকে গ্রাহকদের একমাত্র স্পিড পোস্টে পত্রিকা পাঠানো যাবে। বছরে চারটি সংখ্যা স্পিড পোস্টে পাঠাবার খরচ ২৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গ্রাহক চাঁদা জমা দিতে হবে। মুষ্টিমেয় কিছু গ্রাহক যাঁরা বুক পোস্টে পত্রিকা নেন এবং গ্রাহক থাকার মেয়াদ ফুরোয়নি তাঁদের বাড়তি ডাক খরচ দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সংখ্যা কিছু ৩০ টাকা ডাক খরচ ধরা হয়েছে। আশা করি প্রিয় পাঠক বন্ধুরা আমাদের অসুবিধার কথা বুঝে সহযোগিতা করবেন।

— পরিচালকমণ্ডলী

চিকিৎসা পরামর্শের সেকাল ও একাল

গৌতম মিস্ত্রী

পঞ্চাশ বছর আগে —

ডাক্তার: তুই এই মিকচারটার এক দাগ এক চামচ মধু দিয়ে মিশিয়ে খাবি। রোগ সেরে যাবে।

এখন—

ডাক্তার: আপনি আপাতত এই ট্যাবলেটটা খেয়ে দেখতে পারেন। তবে কোমরের এম আর আই করার পরেই অপারেশনের ডেট দেব। অপারেশনের ঝুঁকি, সাফল্য, বিভিন্ন খরচের প্যাকেজ ইত্যাদির জন্য হাসপাতালের পাবলিক রিলেশন অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যে সমস্ত পাঠকদের বয়স অন্তত ষাট, মিকচারের চিকিৎসার কথা তাঁদের অজানা নয়। কেবলমাত্র স্টেথোস্কোপ সম্বল করে হারিয়ে যাওয়া পাশ করা কিংবা হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন ও এই রচনাটি পড়ছেন, এমন মানুষের সংখ্যা অল্প। আমিও সেই অল্প মানুষের একজন। কৈশোরে অনেকের মতো আমারও চিকিৎসার দরকার হয়েছিল বৈকি। আন্ত্রিক, সর্দি কাশি আর জ্বর-জ্বালার চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করতে হত, কবে স্থানীয় হাতুড়ে ডাক্তার পাড়ায় সাইকেলে টহল দিতে আসবেন। বর্ষাকালে রিফিউজি কলোনির অপ্রশস্ত মাটির রাস্তায় প্রচণ্ড কাদা হত। সাইকেল এসে অদূরের পিচের রাস্তায় সাইকেল রেখে ভগবানসম হাতুড়ে পঞ্চু ডাক্তার আসতেন কলোনির অসুস্থ মানুষদের চিকিৎসা করার জন্য। জ্বরজ্বালা বা অসুখের উপশম না হলে কলোনির কেউ ডাক্তারকে দোষারোপ করতেন না। চিকিৎসা আর হাতুড়ে ডাক্তারের এক্তিয়ারে নেই, এই ব্যাপারটা রোগী বোঝার আগে গ্রামীণ অভিজ্ঞ পাশ-না করা হাতুড়ে চিকিৎসক বুঝে যেতেন। একবার আমার বোনের সর্দিকাশির চিকিৎসাকালে সন্দেহ হওয়ায়, রোগটা যে ডিপথেরিয়া নয় এটা নিশ্চিত হবার জন্য আমার বোনকে বেলেঘাটার আই ডি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ডিপথেরিয়া হয় নি এটা নিশ্চিত জেনে বাকি চিকিৎসা উনিই করেছিলেন।

সময়ের সাথে সাথে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। সেটাই কাম্য। আধুনিককালে একই রোগের জন্য রোগীর ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন মতের চিকিৎসা পরিষেবা বাজারে হাজির। বেছে নেবার কাজ রোগীর পকেটের ও বিশ্বাসের ওপর অসহায়ভাবে নির্ভরশীল। সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবার বিজ্ঞাপন বিভ্রান্তি বাড়ায়। রাজনৈতিক কূটনীতির ভ্রূকুটিতে সরকারি মদতপুষ্ট 'ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান' সনাতন প্রথাগত এতদিনের নির্ভরযোগ্য ওষুধের দোকানগুলির ব্যবসাকে অন্যায্য বলে দেগে দেয়। ন্যায্য মূল্যের ব্র্যান্ডের বাণিজ্যের সাফল্যে আকৃষ্ট হয়ে যায় আরও অনেক সরকারি ও বেসরকারি ব্যবসায়ী। বিভ্রান্তির বদ হাওয়ায় বেচারা রোগীকে কুলোর বাতাস দেয় গুগল-লব্ধ আধখেঁচড়া জ্ঞান। আর বেচারা ডাক্তারকে প্রস্তুত থাকতে হয় যখন রোগী নামতার গতিতে ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বলতে থাকেন।

এমনটা আগে ছিল না। এই অবিশ্বাসের হাওয়া, রোগী বনাম ক্রেতা ও বিক্রেতা বনাম ডাক্তারের ঘাত-প্রতিঘাতের অধ্যায় সেদিন শুরু হয়ে গিয়েছিল যেদিন চিকিৎসা পরিষেবা ক্রেতা সুরক্ষা আইনের জালে বন্দি হল। তখন অবশ্য সু-নাগরিকগণ সঠিকভাবেই ভেবেছিলেন, এইবার খামখেয়ালি ডাক্তারদের জব্দ করা গেল। এমনটা আগে ছিল না বলে অতীতকে জাপটে ধরে থাকা যায় না আধুনিক পৃথিবীতে। বেশ কিছু আইনজ্ঞের কাজ জুটে গেল, ভগবানরূপী ডাক্তারদের আর তারামার্কা বড় হাসপাতালের দাপটকে চ্যালেঞ্জ করার একটা উপায় পাওয়া গেল। তাতে সুচিকিৎসা পাওয়া গেল কিনা জানা নেই। পাওয়া গেল তার চেয়েও বড় পাওয়া—অসহায় রোগীর বিদ্রোহী ইগোয় কিছুটা শান্তিবারি সিঞ্চন আর খোয়া যাওয়া প্রাণের ও তার মানের আধুনিক সমীকরণের হিসাবে কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণের অর্থমূল্য প্রাপ্তি। ভাল করতে চেয়ে চিকিৎসকের অনিচ্ছাকৃত ভুলে একটা চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষতিপূরণের টাকায় নষ্ট চোখ নতুন করে গজাবে না। চিকিৎসকটি পরে হয়ত চোখের অপারেশন না করেই খেয়ে পরে বেঁচে থাকবেন। এই খবরে উৎফুল্ল হয়ে দক্ষিণের কর্পোরেট চোখের প্রতিষ্ঠানগুলো রাজ্যের চোখের চিকিৎসার বাজার অধিকার না করার ঝুঁকি নিল না।

অপারেশনের খরচের সঙ্গে তখন উকিলের খরচ যোগ হয়ে চিকিৎসা কেবল উপযুক্ত চিকিৎসা থেকে একাধিক বিভিন্ন দামের প্যাকেজের চিকিৎসার মোড়কে রোগীর সামনে হাজির হয়ে গেল। কোনটা নেবেন স্যার/ম্যাদাম—তারা মার্কা হাসপাতালের মার্কেটিং একজিকিউটিভ মুচকি হেসে খানদানি ভিয়েনিজ কায়দায় কোমরে দু-ভাঁজ হয়ে হেসে বাও করে বাঁ হাত পেটের ওপর রেখে ডান হাত দিয়ে তলোয়ার চালানোর কায়দায় প্যাকেজের প্রিন্টআউট দেখিয়ে বললেন, বেছে নিন স্যার/মাদাম সবই চিকিৎসার উপায় (বাকভঙ্গির জন্য সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা)।

প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ার মতো ঘটনা। টেকো বুড়ো ফ্যাশন না জানা ডাক্তারের চেয়ে দেবতার দূতের মতো অর্থমূল্যে কেনা ডিজাইনারের মেকআপে সজ্জিত গ্ল্যামারাস সুদর্শন ডাক্তারের বাজার-মূল্য বেশি। এনারাই কর্পোরেট হাসপাতালের ট্রাম্প কার্ড। কলকাতার সেলিব্রিটির হার্টের রোগে এঁরা ব্যাঙ্গালোর থেকে উড়ে এসে জুড়ে না বসলে কলকাতার হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ রোগীকে স্পর্শ করার অনুমতি পান না। চিকিৎসায় দেরি হয়ে যায়। তা যাক। ব্যাঙ্গালোরের ভগবান একই দিনে ব্যাঙ্গালোর থেকে উড়ে এসে ফিরে যাবার আগে মিডিয়ায় বাইট দিয়ে জানিয়ে যান, হার্টে ব্লক আছে এই অনুমান সঠিক। এবার অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হোক। কলকাতার অখ্যাত ডাক্তার এই আফসোস বলার পরিসর পান না, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করার সন্ধিক্ষণ পেরিয়ে গেছে। দেরিতে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে হচ্ছে বলে যে আক্ষেপ করতে হচ্ছে, সেটা নন-সেলিব্রিটিদের ক্ষেত্রে হয় না। এই আক্ষেপের মর্ম রোগীদের বোঝার কথা নয়। গরীব আর সেলিব্রিটি নয় এমন মানুষদের জন্য কিছু প্রাপ্তি নিশ্চিত থাকে, সেই প্রাপ্তি সেলিব্রিটিদের নয়। সেই প্রাপ্তি না পাওয়ার ক্ষতি বোঝার বুদ্ধি থাকলে তাঁরা সেলিব্রিটি না হওয়ার চেষ্টা করার জন্য প্রাণপাত করতেন।

পঞ্চাশ বছর আগে, যখন চিকিৎসা পরিষেবা আইনের জালে বন্দি ছিল না, তখন ডাক্তারদের মনের উপরে চাপ ছিল না। রোগীর কাছে গুগললব্ধ আধখেঁচড়া জ্ঞান আর ক্রয়যোগ্য বিচারালয়ের বেতের ছড়ি ছিল না ডাক্তারদের বশে আনার জন্য। আধুনিক ডাক্তার এখন ফাঁদে পড়ে খাবি খান চামড়া বাঁচানোর জন্য। অতীতে পুরনো সেই অখ্যাত, চিকিৎসায় পোড়-খাওয়া চিকিৎসকরা বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসায় নিয়মে নিরাপদে চিকিৎসা করে যেতেন। আধুনিক যুগের উন্নত(!) চিকিৎসার কাণ্ডারি চিকিৎসকই জানেন আধুনিক চিকিৎসা জনপ্রিয় হলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যে সেটা নিম্নমানের। তা হোক, সেটাই ভারতের মতো আধা-শিক্ষিত কিন্তু অভিজাত সচ্ছল নাগরিকদের উপরে নিরাপদে প্রয়োগযোগ্য। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে স্বাস্থ্য বিষয়ক সফলতার সমীকরণ আলাদা। পোড়-খাওয়া ঝানু বুদ্ধিমান ডাক্তার জানেন, ইগোর লড়াইতে হারায় নিরাপত্তা আছে। সুচিকিৎসা হচ্ছে না জেনেও একালের দরদি বুদ্ধিমান ডাক্তার নির্লিপ্ত হয়ে যান।

সেকালের ডাক্তারদের স্বাধীনতা ছিল। তাঁরা সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন রোগ নিরাময়ে ও নিয়ন্ত্রণে। অসফল হলে রোগীর আত্মীয়দের সাথে চোখের জল ফেলতেন। ডাক্তারের সততা নিয়ে প্রশ্ন ছিল না। ডাক্তারের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি চোখে পড়ত না। এই বিশ্বাসের চিড় ধরল সেইক্ষণ থেকে যখন মামুলি অপারেশনের আগে রোগী ও তাঁর পরিবারের কাছ থেকে অপারেশনের সম্মতিপত্রে সই সাবুদ নেওয়া বাধ্যতামূলক হল। সম্মতিপত্রে সই সাবুদে ডাক্তারদের কাঁধ থেকে চাপের বোঝা একটু হাল্কা হল।

এই পরিবর্তনের কারণ অজানা নয়। সেকালের ডাক্তারদের স্বাধীনতা ছিল। তাঁরা সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন রোগ নিরাময়ে ও নিয়ন্ত্রণে। অসফল হলে রোগীর আত্মীয়দের সাথে চোখের জল ফেলতেন। ডাক্তারের সততা নিয়ে প্রশ্ন ছিল না। ডাক্তারের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি চোখে পড়ত না। এই বিশ্বাসের চিড় ধরল সেইক্ষণ থেকে যখন মামুলি অপারেশনের আগে রোগী ও তাঁর পরিবারের কাছ থেকে অপারেশনের সম্মতিপত্রে সই সাবুদ নেওয়া বাধ্যতামূলক হল। সম্মতিপত্রে সই সাবুদে ডাক্তারদের কাঁধ থেকে চাপের বোঝা একটু হাল্কা হল। ঝুঁকি ভাগ করে নেয়ার (shared decision) ফলে ডাক্তার আইনের চোখে নিরাপদ দূরত্বে থেকে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে থাকলেন। এর পরে কনজিউমার ফোরাম বেয়াড়া ডাক্তারদের আরও কড়া নজরে রাখতে লাগল আর তার জেরে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ডাক্তারদের সুরক্ষিত রাখার আশ্বাসে ব্যবসা শুরু করে দিল। ডাক্তাররা বিমা কোম্পানির সেই অতিরিক্ত খরচের বোঝা বাজারের নিয়মেই উপভোক্তা স্বরূপ রোগীর ঘাড়েই চাপাতে বাধ্য হলেন। শুরু হয়ে গেল ডাক্তারদের নিজের চামড়া বাঁচানোর তাগিদে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব রকম পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে নেবার চল।

চিকিৎসার খরচ ঊর্ধ্বমুখী হলেও বিচার বিভাগ আর আইনজ্ঞদের ব্যবসার এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। রোগী আর চিকিৎসকের পুরাতন বিশ্বাসের জায়গা বাজারের এক নতুন পণ্য-অবতারে পরিণত হল।

চিকিৎসার বাজারে একই রোগের চিকিৎসা সবার জন্য একই মানের ও দামের আর রইল না। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অভিজাত-বুনো—সবার জন্য ন্যায্য ও বিধিসম্মত একই মানের চিকিৎসার বদলে এসে গেল হরেক রকমের ভিন্ন ভিন্ন দামের চিকিৎসা-পণ্য। রোগীর পকেটের হিসাবে চিকিৎসা বিক্রির বন্দোবস্ত হয়ে গেল। গরীব রোগীদের বেশি দামের চিকিৎসা ক্রয় করতে না পারার ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হওয়া অনিবার্য হয়ে গেল। সেফটি-ভাল্ব হিসাবে চালু হল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের অপ্রতুল, অস্বচ্ছ নিঃশুল্ক চিকিৎসা-প্যাকেজ। দুর্জনেরা বলেন, সেই সব প্যাকেজের ব্যবহারের চেয়ে দুর্নীতিই নাকি বেশি।

যাই হোক, নীতি বজায় রইল কী রইল না সেসব উহ্য থেকে যায় যখন রোগীর মৃত্যু হয়। বিশেষ করে সরকারি নিঃশুল্ক প্যাকেজের বাইরে ধারদেনা করেও যখন প্রিয়জনের প্রাণ বাঁচানো গেল না, তখন বিশাল মাপের এক পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণে ডাক্তার-নার্স পিটুনি, হাসপাতাল ভাঙচুর জলভাত হয়ে গেল। এমন হলে আজকাল অকুস্থল থেকে পুলিশ পালিয়ে যায়। পড়ে থাকে ক্ষতবিক্ষত চিকিৎসা পরিষেবা আর হতাশ দিশাহীন সাধারণ নাগরিক। ডাক্তাররা কিছুদিন বিপ্লব করেন বটে, তবে সময়ের সাথে সাথে সমাজের ক্ষত মিলিয়ে যায় সামাজিক পরিকাঠামোর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই। সাধারণ নাগরিকরাও মানিয়ে নেন, অপেক্ষা করেন পরের আঘাত অবধি।

সরকারি হাসপাতাগুলি আইনের ঊর্ধ্বে ছিল এতকাল। অন্তত সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের কাজের বেনিয়মে কনজিউমার ফোরাম ইত্যাদি আইনের ফাঁদে ফেলা যেত না, এখনও যায় না। তবে কিনা আইনের গণ্ডির বাইরে আজকাল নানাবিধ সামাজিক মাধ্যম সক্রিয়। সেই মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালের বেনিয়মের কবচ পলকা।

নবীন ডাক্তাররা এইসব দেখে যদি ডাক্তারি পেশায় প্রবেশ করতে না চায়, বা ডাক্তারি পেশার ঝুঁকিবিহীন শাখায় নিজেদের কর্মকাণ্ড সীমিত রাখে তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। রাজনৈতিক রঙ বা 'কানেকশন' ছাড়া স্বাধীনচেতা উচ্চশিক্ষিত নবীন ডাক্তার যখন পাশ করে বেরোলেন, তার সামনে তিনটি পথ। সরকারি চাকরি, বেসরকারি হাসপাতালে চাকরি বা প্র্যাক্টিস, অথবা ছত্রছায়াবিহীন একদম শূন্য থেকে শুরু করা প্রাইভেট প্র্যাক্টিস। প্রথমটায় স্বাস্থ্যভবনের মোসাহেবগিরি না করতে পারলে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের প্রসূতিসদনে নাইট ডিউটি দিতে হয়। দ্বিতীয়টায় বেসরকারি হাসপাতালের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য অনৈতিক চিকিৎসার পাঠ রপ্ত করতে হয়। আর তৃতীয়টায় মালুম হয়, ডাক্তার না হয়ে বিগত আট-দশ বছর আগে রাস্তার মোড়ে একটা এগরোলের দোকান দিলে এতদিনে বছরে দুবার করে দুবাই, থাইল্যান্ড, ইউরোপ ইত্যাদিতে ভ্রমণ সারা হয়ে যেত। এমবিবিএস-এর পরে একটা 'এম ডি' বা 'এম এস' না হলে আজকাল পাত্তা পাওয়া ভার। কিছুকাল আগেও সার্জন (এম এস) বা অপারেশন করেন এমন ডাক্তারদের ওষুধ দেওয়া ডাক্তারদের (এম ডি) চেয়ে বড় ভাবা হত জনমানসে। এই তুলনার অবিচারের বিচার প্রাসঙ্গিক নয়। যেটা প্রাসঙ্গিক, এই বছর সার্জারিতে স্নাতকোত্তর পড়তে চাইছেন না প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল পড়ুয়াদের উত্তমাংশ। খবরে (২৬.১১.২০২৪) প্রকাশ, নিট পিজি প্রথম রাউন্ডের কাউন্সেলিং-এ প্রথম ১৫০০ স্থানাধিকারীর মধ্যে কেবল মাত্র ১৪ শতাংশ সার্জারি বিভাগে ভর্তি হতে চাইছেন। চিকিৎসায় ঝুঁকি নেওয়ার ডাক্তার তৈরি হচ্ছে না। যারা ঝুঁকি নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে মানুষের প্রাণ বাঁচাতেন, তাঁরা ঝুঁকি নেওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না, নিজের চামড়া বাঁচানোর তাগিদে। ঝুঁকিবিহীন, আপৎকালীন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই এমন চিকিৎসা শাখা— রেডিওলজি, ই এন টি, ডারমাটোলজি, প্যাথোলজি কম চ্যালেঞ্জের হলেও হবু ডাক্তারদের কাছে নিরাপদ চিকিৎসার শাখা।

এমন দিন বেশি দূরে নেই, যখন চিকিৎসা পরিষেবা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আপনি কতদিন বাঁচতে চান, যেমন করে কাপড়ের দোকানদার জিজ্ঞেস করেন আপনি খাদি না বেনারসি শাড়ি কিনবেন। জীবনের সায়াহ্নে এসে আপনার কাছে এমন কঠিন প্রশ্ন আসতে চলেছে। বৃদ্ধ বয়সে আপনি আরও কয়েক বছর বেশি বাঁচতেই পারেন। সেই বাঁচা আপনার কাছে যে অর্থমূল্যে সেই অর্থের অন্য ব্যবহার আপনার কাছে অগ্রাধিকার পাবে কিনা সেটাও বিচার্য। সেই প্রশ্নের উত্তর বড় কঠিন হলেও অনেক সময় প্রাসঙ্গিক।

উ মা

বিজ্ঞান ও কুসংস্কার

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

একটা হাস্যকর ঘটনা যুক্তিবাদীদের, বিশেষ করে আমাদের দেশে, সমস্যা সামনে নিয়ে এসেছে। একদল মহাকাশ বিজ্ঞানী তাদের যানের উৎক্ষেপণের আগে দৈব সাহায্য চেয়ে তার একটি ছোট প্রতিলিপি এক জনপ্রিয় দেবতার পায়ের কাছে রেখে এসেছিলেন।

এটা মনে হতে পারে যে দেশের অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত সেখানে অশিক্ষার বোঝা বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি করার পক্ষে প্রধান বাধা। খুব অল্প লোকই সন্দেহ করবেন যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। বিজ্ঞানী বলে চিহ্নিত করা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তারাই আদতে অলঙ্ঘনীয় বাধা। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কিভাবে একজন বিজ্ঞানী কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতে পারেন, কারণ বিজ্ঞান ও কুসংস্কার দুটো বিপরীতার্থবোধক শব্দ।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিজ্ঞানীদের বিষয় বুঝতে হলে বিজ্ঞানী কথাটা নিয়ে ভেবে দেখা দরকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা একটা পেশার বিবরণ মাত্র। যে মানুষেরা সাধারণভাবে বিজ্ঞানী বলে চিহ্নিত তাদের অধিকাংশই নিজেদের পেশায় অন্যরা যেসব জ্ঞান, বিজ্ঞানের সঠিক পদ্ধতিতে আহরণ করেছেন তা ব্যবহার করেন। তাদের পেশায় কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে চলার প্রয়োজন নাও হতে পারে। এমনকি তারা সে ব্যাপারে সজাগ নাও হতে পারেন। এদের ক্ষেত্রে 'বৈজ্ঞানিক' শব্দটি ব্যবহার ঠিক যথার্থ নয়। তারা আসলে বিজ্ঞানকর্মী---যেমন প্রযুক্তিবিদ বা প্রকৌশলীরা।

দুঃখের কথা যে সত্যিকারের বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের মধ্যেও কুসংস্কারে ডুবে থাকাদের পাওয়া কঠিন নয়। (আমার মনে পড়ে একটি বিখ্যাত দৈনিকে একজন তরুণ এবং বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানীর একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, চলতি কুসংস্কারগুলোর মধ্যে কিছু কিছু উপকারী)।

কোনো কোনো স্নায়ুবিজ্ঞানী যেমন বলে থাকেন এটা নিশ্চয়ই সেই খণ্ডিত মন যা মানুষের যুক্তিপ্রবণ মনের খণ্ডকে আবেগপ্রবণ খণ্ড থেকে আলাদা করে রাখে। কোনো কোনো স্নায়ুবিজ্ঞানীর তত্ত্ব আবার এ পর্যন্ত বলে থাকে যে মানুষের মনে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস যুক্তিনির্ভরতার উন্মেষের অনেক আগেই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষা এইসব আদিম দুর্বলতাগুলোকে বিজ্ঞানীদের মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি।

'বিশ্বাসী' বৈজ্ঞানিক হিসেবে আইনস্টাইন ও আরও কয়েকজনের নাম করা খুবই অসংগত। কেউ কেউ যেমন করে থাকেন। তাঁদের 'বিশ্বাসে' অতিপ্রাকৃতের জায়গা নেই এবং কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা স্তরের। আধুনিক বিজ্ঞান অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আরও কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, যার সবচেয়ে সহজ উত্তর হচ্ছে একটি 'নক্সা', অতএব এক 'নক্সা'কারের দিকে ইঙ্গিত করা।

কিন্তু যাঁরা এমন 'পরম নক্সাকারের' সপক্ষে সোচ্চার হন তাঁরাও একথা মেনে নিতে ঘৃণা বোধ করবেন যে তিনি একটা নভোযানের প্রকৌশলের সর্বশেষ পরীক্ষা করে দেবেন। এই সব বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ যথার্থভাবেই মূলত অধার্মিক, কিন্তু এমনকি গভীরভাবে ধার্মিক ব্যক্তিরা। যেমন রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধী, একথা ভেবে শিউরে উঠবেন যে সর্বশক্তিমান এই স্তরে কাজ করেন যে তাকে দিয়ে যাঁরা নভোযান তৈরি করেছেন তাদের ভুলগুলো শুধরে নেয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হল এই সব অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসগুলোকে কি অন্য একটি ধর্মমত মনে করে ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে মেনে নেয়া যায় (যেমন অনেকেই করছেন)? না এগুলো সোজাসাপটা কুসংস্কার, যা কোনো ধর্মমতই অনুমোদন করে না। বরং একে যুক্তিনির্ভর চিন্তার বিপরীত বলেই বিরোধিতা করা উচিত। অনেকেই এই সব অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসগুলোকে একটি বিকল্প ধর্মমত বলে গণ্য করার পক্ষপাতি। এখন প্রশ্ন ওঠে যে তাহলে কি ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে এগুলোকে সহ্য করা হবে না সোজাসুজি যুক্তি নির্ভর চিন্তার বিপরীত, কুসংস্কার বলে বিরোধিতা করা হবে? অন্যভাবে বলতে গেলে যারা অলৌকিক হস্তক্ষেপে যাজ্ঞা করেন আমরা কি তাদের নীতিগতভাবে সমকক্ষ আর তাদের উদ্ভট বিশ্বাসকে একটি বিকল্প মতবাদ বলে মান্যতা দেবো (যেমন কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন) না বিজ্ঞান বিরোধী পশ্চাদমুখী বলে অবজ্ঞা করব?

দুর্ভাগ্যবশত এইসব প্রশ্নের সহজ ও সোজাসুজি উত্তর সাধারণত অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না, কারণ যাদের সবাই যুক্তিবাদের ধারক বলে গণ্য করে এটা তাদের বিরুদ্ধে যায়। আর একটিমাত্র কারণ হস্তরেখা গণনা আর জ্যোতিষের (এবং গ্রামাঞ্চলে ডাকিনি বিদ্যার) প্রতি চলতি বিশ্বাসের সবথেকে জোরালো সমর্থন জোগায়। আমাদের বুঝতে হবে যে এই কারণটিই আমাদের দেশে বিজ্ঞানমনস্কতা ছড়ানোর সবচেয়ে প্রবল বাধা আর এটিকেই সর্বপ্রথম মোকাবিলা করতে হবে। উমা

আর জি কর ডায়েরি

পিনাকীকুমার গাঙ্গুলী

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসক-ছাত্রীকে খুন ও ধর্ষণের অভিযোগের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া অ-ভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলনে ইতিহাস তৈরি হয়েছে। দিল্লির 'নির্ভয়া' কাণ্ড থেকে কামদুনি-হাথরস—গত এক দশকের মধ্যে হওয়া এমন একাধিক নারী নির্যাতন বিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের সদর্থক ক্রম পরিণতি যেন আর জি কর কেন্দ্রিক গণ-আন্দোলন। শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হওয়া আন্দোলনের পরিসর রাজ্য, দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে পৃথিবীর বহু মানুষকে ব্যথিত, ক্রুদ্ধ করেছে। পরন্তু মিশেছে প্রতিবাদ, প্রতিস্পর্ধা, ভরসা, শ্রদ্ধা আর মায়া-ভালবাসা। আর জি করের মহিলা ডাক্তারের বিরুদ্ধে হওয়া নির্মম, অভাবনীয় অত্যাচারের বিচার চাওয়ার ডাকে জুড়ে গিয়েছে একজন মহিলার বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের বিচারের দাবি, একজন সহনাগরিকের বিরুদ্ধে হওয়া নির্মম, অভাবনীয় অত্যাচারের বিচার চাওয়ার ডাকে জুড়ে গিয়েছে একজন মহিলার বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের বিচারের দাবি, একজন সহনাগরিকের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের উপযুক্ত শাস্তির দাবি—সর্বোপরি সাধারণ ন্যায়বিচারের দাবি। বহু মিছিলে এমন অনেক অশক্ত বয়স্ক মানুষ দেখা গিয়েছে যাঁরা আগে রাস্তায় নামেন নি। বহু ছাপোষা মানুষ, গৃহবধূ, গৃহ শ্রমিকদের অনেকে সংসার-হেঁশেল সামলে পা মেলালেন মিছিলে। এঁদের অনেকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ রাজনীতির ধার ঘেঁষেন না বরং ঝুট-ঝামেলা এড়াতেই পছন্দ করেন। এঁরাও জুড়ে গেলেন মৌনী মিছিল, প্রতিবাদে, করে ফেললেন অবরোধ। আন্দোলন একসময় এমন উচ্চতায় পৌঁছল যেখানে মিছিল মানুষকে নয়, মানুষ খুঁজে নিল মিছিলকে—হল রাতদখল, ভোরদখল। সাহস আনল সাহস। ঘটনার ৯০ দিন পার হওয়ার পরেও শিয়ালদহ আদালতে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা না দেওয়ায় তরুণী চিকিৎসক-পড়ুয়া খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় জামিন ঘিরে প্রতিবাদের স্বর তুলে নতুন বছর, ২০২৫ সালেও জারি রয়েছে অবস্থান, প্রতিবাদ।

২

৯ আগস্ট, ২০২৪ আর জি কর হাসপাতালের পালমোনারি মেডিসিন বিভাগের সেমিনার হলে চিকিৎসক-পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়। পরের দিন, শনিবার থেকে প্রতিবেদন প্রকাশের দিন পর্যন্ত সংবাদপত্র-টেলিভিশন থেকে সমাজমাধ্যমে শীর্ষ আলোচনায় থেকেছে প্রসঙ্গটি। প্রথম দিনেই মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারদের বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। প্রশ্ন ওঠে, শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখেও পুলিশ আত্মহত্যা বলল কেন? উঠে যায় 'বিচার চাই' দাবি। সেমিনার হল সংস্কারের ছলে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টায় তেতে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। তদন্ত প্রক্রিয়ায় পুলিশ, প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে জনতার একাংশ স্বাধীনতার রাত, ১৪ আগস্ট মধ্য রাতে পথে নামার ডাক দেয়। 'মেয়েরা রাত দখল করো' (রিক্লেম দ্য নাইট)—এই আহ্বানের পর থেকেই আন্দোলন ক্রমশ গণআন্দোলনের চেহারা নিতে শুরু করে। কথায়, গানে প্রতিবাদ তখন শহর ছাড়িয়ে জেলায় জেলায় প্রসারিত। সব ছবি উঠে আসছে গণমাধ্যম, সমাজমাধ্যমে। কোথাও ভাইরাল হচ্ছে স্কুল শিক্ষিকার মন্তব্য, 'নিজেদের অধিকারের জন্য যে কোনও ভিক্টিমের (নির্যাতনের শিকার) পাশে দাঁড়াও! না হলে তুমি তোমার অধিকার কোনও দিনও খুঁজে পাবে না।' ধর্মতলার মোড়ে প্রতিবাদীদের হাতের লালপতাকায় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বেগম রোকেয়ার ছবি। মিছিলের জনতা জানায়, সব পেশার দুর্বৃত্তদের উৎখাত করতেই তারা পথে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল—যুযুধান দুই ক্লাবের সমর্থকেরা মিশে গিয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশাল ফ্লেক্সে লেখে— 'হাতে হাত রেখে এ লড়াই। আমাদের বোনের বিচার চাই।' আমাদের মনে পড়ে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা,

ব্রিটিশ ভারতের খ্যাতনামা চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ করের (১৮৫০-১৯১৮) কথা। তিনি রোগের কারণ হিসেবে দারিদ্রকে চিহ্নিত করেন, হাসপাতাল তৈরির গুরুত্ব অনুভব করেন এমনকি বাংলা ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্রের একাধিক বই লেখেন। আশা-ভরসার সেই হাসপাতালেই ওঠে দুর্নীতির লাগামছাড়া দুর্নীতি, ক্যাপসুল, ট্যাবলেটের মোড়ক বা তরল ওষুধে ভয়াবহ কারচুপির অভিযোগ।

৯ আগস্ট থেকে গোটা মাসে ঘটনার ঘনঘটা, তেমনই পরবর্তী সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাস জুড়ে কত মিটিং, মিছিল হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা দেখি, এই আন্দোলনের কেন্দ্রে জুনিয়র ডাক্তাররা আর সময়ের ডাকে জুড়ে গিয়েছেন সিনিয়র চিকিৎসকরা, তাদের সঙ্গে ধর্ম-বর্ণ-জাতির সব বয়সের নানা পেশার সাধারণ মানুষ। শারদীয়া নিকটে হলেও প্রতিবাদের জোয়ারে খাঁ খাঁ করছে কুমোরটুলি। রাতের মিছিলে মোবাইলের ফ্লাশলাইটে জ্বলে ওঠা আলোয় অজস্র প্রতিবাদী কণ্ঠ বলছে, 'ধর্ষকরা নিপাত যাক', 'তোমার স্বর, আমার স্বর, জাস্টিস ফর আর জি কর।' মিছিলে থেকেছে প্রতীকী মেরুদণ্ড, প্রতীকী মস্তিষ্ক কখনও প্রতীকী চোখ। আইসিডিএস, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা মিছিলে হেঁটেছেন। বিচার চেয়ে সাইকেলে সাগর থেকে সান্দাকফু গিয়েছেন স্কুলশিক্ষক। এভারেস্টের বেসক্যাম্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কলেজ শিক্ষক। তেমনই প্রতিবাদীকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে ভাড়া নিতে চান নি অনেক রিক্সাওয়ালা। উত্তর দিয়েছেন, এ তো তাঁরও আন্দোলন। প্রতিবাদীরা সকলেই সন্তান হারানো বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে সুবিচারের প্রত্যাশী হয়েছেন। মিছিল হয়েছে রাজনৈতিক দলের পতাকা ছাড়াই। সামাজিক এই যৌথতা বড় পাওনা।

নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের ততদিনে এক মাস পার। উঠে এসেছে 'থ্রেট কালচার' বা হুমকি প্রথার কথা। আর জি কর হাসপাতাল কিংবা শিক্ষাক্ষেত্র নয়, রাজ্যের প্রতিটি পরিসরে এই সংস্কৃতি বহমান এমন অভিযোগও ওঠে। পরীক্ষায় অন্যায়ভাবে ফেল করানো, বেশি নম্বরের সংস্কৃতি, অর্থের বিনিময়ে বদলি থেকে বিরুদ্ধ মতের লোকেদের শায়েস্তা করার মতো নানা প্রসঙ্গ তখন চর্চায়। ২০ সেপ্টেম্বর জানা গেল, তরুণী চিকিৎসককে খুন এবং ধর্ষণের প্রতিবাদে চলা টানা ৪১ দিনের কর্মবিরতি আংশিকভাবে উঠতে চলেছে। দ্রুত ন্যায়বিচারের দাবি এবং এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি আটকাতে গণ কনভেনশনের ডাক দেয় 'ওয়েস্টবেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট'। রাতের কলকাতায় দেখা যায় প্রতিবাদের মশাল মিছিল। ১ অক্টোবর কলেজ স্কোয়ারে থেকে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, ২ অক্টোবর কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা, ১৫ অক্টোবর দ্রোহের কার্নিভাল ও দ্রোহের মানববন্ধন তার অন্যতম। কলকাতার বড় পুজোগুলির প্রতিমা রেড রোডে এনে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এক দিন অনুষ্ঠিত হল পুজো কার্নিভাল, ওই দিনই বিচারের দাবিতে এবং অনশনরত জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি সংহতি জানিয়ে রানি রাসমণি রোডে 'দ্রোহের কার্নিভাল' দেখলাম আমরা। হল মানববন্ধন, বাজল ঢাক। মহালয়ার দুপুরেও শহরের রাজপথ ভেসেছে মহামিছিলে। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আংশিক কর্মবিরতি ও অবস্থান মঞ্চ, লালবাজার অভিযান, স্বাস্থ্যভবন অভিযান এবং সেখানে অবস্থান—ঘটে গিয়েছে একের পর এক।

ঘটনার ৫৮ দিনের মাথায় কলকাতা পুলিশের হাতে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। সিবিআইয়ের আইনজীবীদের দাবি ছিল, চিকিৎসক-পড়ুয়ার খুন, ধর্ষণ এবং প্রমাণ লোপাটে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারে। এ দিকে, জুনিয়র ডাক্তাররা ৯ আগস্ট থেকে মাসব্যাপী আংশিক কর্মবিরতির পুরোটা সময় সিনিয়র ডাক্তাররা অতিরিক্ত কাজ করে জরুরি পরিষেবা চালু রাখেন। তবু বিপুল পরিমাণ রোগীর কারণে দুর্ভোগ এড়ানো যায় না বহু ক্ষেত্রে। একাধিক জায়গায় ক্যাম্প চালু হয় 'অভয়া ক্লিনিক'। যুক্ত হয় টেলিমেডিসিন পরিষেবা। পুজোর মুখে মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে শুরু হয় অনির্দিষ্টকালীন অনশন কর্মসূচি। ৫ অক্টোবর, শনিবার রাতে মেট্রো চ্যানেলের অবস্থান মঞ্চে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা জানান দাবিপূরণের স্বার্থে আমরণ অনশনের পথে হাঁটবেন। উঠে আসে দশ দফা দাবি। একনজরে দাবিগুলি হল— স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত নির্যাতিতার ন্যায়বিচার, রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে কেন্দ্রীয়ভাবে 'রেফারেন্স' ব্যবস্থা (রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া) চালু করা, প্রতিটি হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজে কতগুলি বেড ফাঁকা রয়েছে, তা জানানোর জন্য ডিজিটাল মনিটরের ব্যবস্থা। জুনিয়র ডাক্তারদের নির্বাচিত প্রতিনিধি রেখে প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কলেজভিত্তিক টাস্ক ফোর্স গঠন করা। সিসিটিভি, ডাক্তারদের জন্য অন কল রুম, শৌচালয়, হেল্পলাইন নম্বর, প্যানিক বোতাম চালু করা। হাসপাতালগুলিতে সিভিক ভলান্টিয়ারের

পরিবর্তে পুলিশকর্মীদের মোতায়েন। এছাড়া, হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ, বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে যাঁদের বিরুদ্ধে 'ভয়ের রাজনীতি' চালানোর অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান কমিটি গড়ে শাস্তির ব্যস্থা করা এবং পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং পশ্চিমবঙ্গ হেল্‌থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দুর্নীতি ও বেনিয়মের অভিযোগগুলি প্রসঙ্গে দ্রুত তদন্তের দাবি তোলা হয়। টানা ১৭ দিন অনশন চলবার পর হয় নবান্ন সভাঘরে বৈঠক। ছিল লাইভ স্ট্রিমিং-এর ব্যবস্থা। বিবিধ টানাপোড়ের পরে ২১ অক্টোবর ওঠে অনশন। এই পর্যায়ে বাঙালি পেরিয়ে এসেছে শারদোৎসব। পুজোর আবহেও প্রতিবাদের পারদ নামে নি। বরং কলকাতা শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিভিন্ন জেলার গ্রাম-মফস্বলে ছড়িয়ে পড়েছে। বিক্ষোভ-প্রতিবাদে পুজো পার করে বিসর্জনেও অব্যাহত থেকেছে। প্রতিমা বিসর্জনেও দেখা গিয়েছে ভিন্ন দৃশ্য—কোথাও বিজয়া দশমীতে কালো শাড়ি পরে সিঁদুর খেলেছেন মহিলারা, কোনও মণ্ডপে স্লোগান উঠেছে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। এই আন্দোলন জন্ম দিয়েছে টুকরো বহু ছবির। যেমন, স্কুলফেরত ছাত্রী মঞ্চে এসে মাইক চেয়ে শুনিয়েছে প্রতিবাদী কবিতা, কখনও সহমর্মিতা জানাতে হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে মঞ্চের কাছে চলে এসেছেন একাকী অশীতিপর বৃদ্ধা। 'রাত দখল'-এর ডাক সমাজ মাধ্যম, মুঠোফোনের মাধ্যমে সহজবোধ্য বাংলায় পৌঁছে গিয়েছে আমজনতার কাছে। তাতে অভূতপূর্ব সাড়া এসেছে সব স্তরের মেয়েদের থেকে। আমাদের দেশে 'রাত দখল'-এর ডাক দিয়ে প্রথম প্রতিবাদ হয় নির্ভয়ার ঘটনার পরে, ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালে। 'সিটিজেন্স কালেক্টিভ এগেনস্ট সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট' নামে দিল্লির এক গোষ্ঠী 'টেক ব্যাক দ্য নাইট' ক্যাম্পেনের ডাক দেয়। তার পর তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের অন্যত্র। আর জি করের পরে কলকাতা ও একাধিক জেলা, মহকুমা, পুরশহরে হওয়া এই 'রিক্লেম দ্য নাইট' ঘিরেও হয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রসঙ্গত, 'রিক্লেম দ্য নাইট' শুরু হয়েছিল ১৯৭৭ সালে লিডসে, নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ হিসাবে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড জুড়ে এই আন্দোলন চলেছিল। অনেকে মনে করেন এর অনুপ্রেরণা এসেছিল ১৯৭০-র দশকে, আমেরিকায়। ১৯৭৭ সালে জার্মানির একাধিক শহরে মহিলাদের উপরে হওয়া অত্যাচার ও ধর্ষণের প্রতিবাদেও মিছিল করেছিলেন মহিলারা।

এ দিকে, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসও পার হয় ন্যায়বিচারের আন্দোলনে। ৯ নভেম্বর কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে গিয়ে 'জনতার চার্জশিট' পেশ করে 'অভয়া মঞ্চ'।

তার আগে ৪ নভেম্বর আশাকর্মীদের সিজিও অভিযান আর পাড়ায় পাড়ায় 'দ্রোহের আলো' জ্বালিয়ে চলে প্রতিবাদ। জনতার বিচারে কারা 'অভিযুক্ত' এবং আরজিকরের ঘটনার 'দায় কার'—তা নিয়ে মানুষের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়। ঘটনার ৯০ দিন পার হওয়ার পরেও সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা না দেওয়ায় অভিযুক্তদের জামিন ঘিরে প্রতিবাদের নতুন স্বর ওঠে। ২০২৫ সালেও ন্যায়বিচারের দাবিতে জারি রয়েছে অবস্থান, প্রতিবাদ।

৩

অন্ন, বস্ত্র, খাদ্য, বাসস্থানের মতো মৌলিক দাবিতে বহু আন্দোলন হলেও সুচিকিৎসার দাবিতে চিকিৎসকদেরই প্রণোদনায় তেমন দেখা যায় নি।১৯৮৩ সালে এবং ১৯৮৭ সালে 'অল বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশন'-এর ডাকে হওয়া আন্দোলনের অধিকাংশ দাবি মানুষের স্বার্থে হলেও তাতে ভাতা বৃদ্ধির দাবি ছিল। সিনিয়র চিকিৎসকদেরও সকলে আজকের মতো ব্যতিক্রমী চেহারায় জুনিয়রদের সহযোগী হিসেবে ছিলেন না। তখন আওয়াজ উঠেছিল— 'স্বাস্থ্য কোনও ভিক্ষা নয়, স্বাস্থ্য আমার অধিকার'। ১৯৮৭ সালে ধর্মঘট চলেছিল ৪৩ দিন। সেই সময়েও নাগরিক সমাজের একাংশ পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের। তবে সাম্প্রতিককালের মতো ব্যাপক চেহারায় নয়। দশ দফা দাবিতে আমজনতাও নিজেদের দাবিদাওয়ারওই প্রতিফলন দেখেছিলেন। এই আন্দোলনের অন্যতম জরুরি দিক হল মেয়েদের সজাগ, সক্রিয় অংশগ্রহণ। মেয়েরাই থেকেছে সামনের সারিতে। দিয়েছে নেতৃত্ব। অনেকেই প্রকাশ্যে কিংবা সমাজমাধ্যমে নিজেদের জীবনে যৌন হিংসার অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন, কেউ সমালোচনা করেছেন পুলিশি ও রাষ্ট্রীয় নিষ্ক্রিয়তার, জমায়েতের সামনে রেখেছেন পিতৃতন্ত্র বিষয়ে নিজেদের ভাবনাও স্পষ্ট স্বরে জানিয়েছে বহু মেয়ে। একজন গৃহ শ্রমিক বা সংখ্যালঘু ঘরের মেয়ের নিজের মুখে তাঁর যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাও শুনতে চেয়েছে এই আন্দোলন। ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের অভিঘাত এমন যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের গ্রন্থাগারে থাকা ন্যায়ের শুভ্র নারীর মূর্তির চোখে বাঁধা কলো কাপড় খুলে ফেলা হল। ন্যায়বিচারের আশাও যেন নতুন করে চোখ মেলল।

উমা

লিমেরিটনিক

অনার্য মিত্র

১.

বলো তবে আজ কে কে প্রস্তুত, হবে গণধর্ষিতা?
লাশ হয়ে গেলে কড়া পাহারায় গোপনে জ্বলবে চিতা।
রাষ্ট্র তখন বড়ো ব্যথা পাবে
সন্তানহারা মা-র কাছে যাবে
লক্ষ লক্ষ টাকায় তাঁকে যে করবেন বিভূষিতা।

২.

সেই দিন কারা উঠেছিল তবে বাবরির গম্বুজে?
আটাশ বছর প্রতীক্ষা শেষে আমরা গিয়েছি বুঝে।
আমাদের চোখে ভৌতিক মায়া
ওরা ছিল সব কায়াহীন ছায়া
কোনো ধ্বংসেই কক্ষনো আর মরব না দোষী খুঁজে।

৩.

মন্দির, নাকি মসজিদ হবে সেই ঘোরতর দ্বন্দ্বে
বিচারপতিও চুল ছিঁড়ছেন, পড়েছেন মহা ধন্ধে।
তিনিও বিচার চান করজোড়ে
ষাষ্ঠাঙ্গেই দেবতার দোরে
দেবতা বলেন, 'মন্দিরই হোক, থাকো সবে রামানন্দে'।

৪.

ধাপে ধাপে যদি দুর্নীতি বাড়ে, কেন অকারণ ভয়?
কোষাগার থেকে তখন কিছুটা অর্থ ছড়াতে হয়।
মন্ত্রী থেকেই আগাপাশতলা
দুর্নীতি এক শিল্পিত কলা
অর্থের জোরে ভোটে যে তোমার হবেই গো হবে জয়।

৫.

আপন তেজেই বলীয়ান তিনি, তিনিই বিশ্বগুরু
স্বঘোষিত গুরু নিজেই নাচান তাঁর উদ্ধত ভুরু।
শুধু গুরু নন, তিনি পুরোহিত
তাঁর সখ্য যে রামের সহিত
তাঁর পূজা পেলে তবেই তো রাম ভোজন করেন শুরু।

৬.

তদন্ত করা অত সোজা নয়, ষড়যন্ত্রের মূলে
যেতে হবে তাই দায় নিয়েছেন সিবিআই হাতে তুলে।
লাগুক সময়, বেলা বয়ে যাক্
বছরের পর বছর গড়াক
ফলের আশায় যাবই না হয় শূন্যের উপকূলে। উমা

পুরুলিয়ার পুঁথিদাদু

গুরুচরণ গড়াই বললে চট করে লোকে চিনবে না। পুরুলিয়ার বুরদা-র পুঁথিদাদু বললে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা একডাকে চিনে নেবে মানুষটিকে। ছোটবেলায় পিতৃহারা। দারিদ্র্যের সঙ্গে মানুষটির লড়াই তখন থেকেই পাশে মা'কে পেয়েছিলেন তাই রক্ষে। রামায়ণ-মহাভারত পড়া মা ছেলের লেখাপড়ায় উৎসাহ দিয়েছেন। ৩০ কিলোমিটার দূরে একটিই হাই স্কুল, বালক গুরুচরণ সেখানেই ভর্তি হলেন। পেট চলে না, ক্লাস সেভেনেই স্কুল-ছুট। তবে পড়াশোনার শেষ হল না। কৈশোরেই প্রেমে পড়েন—বইয়ের প্রেমে। আর নেশা বলতে বইয়ের পাতা। রোজগার বলতে ধান বেচে যেটুকু হয় সেটুকুই। কিন্তু তা থেকেই বাঁচিয়ে বই কেনা। পড়া, খুঁটিয়ে পড়া। গুরুচরণবাবু পাড়া প্রতিবেশীকে লেখা সংগ্রহের বইগুলি নিয়ে গড়ে তুললেন 'চৈতন্য গ্রন্থাগার'। ওঁর বইঘর বইতে ঠাসা। বেশিরভাগই ধর্মগ্রন্থ। গুরুচরণবাবুর ছেলের কাছে শুনলাম, মহাভারতের কয়েকটি পাতা ইঁদুরে কেটে দিয়েছিল, বহুকষ্টে এর-ওর কাছ থেকে খুঁজে এনে অক্ষরগুলি ফাঁকা অংশে সাজিয়ে নেন। স্বীকৃতি একেবারে পান নি বলাটা ভুল। দু-একটি বিদ্বৎসমাজ ওঁর বইয়ের জন্য বাঁচা-র অদম্য ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়েছিল। পুঁথিদাদু দেখিয়ে গেলেন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য ছাড়াই শুধু মনের জোর আর কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসা সম্বল করেই বড় কাজ করা সম্ভব। **প্রতিবেদক — সঞ্জয় অধিকারী** উমা

অরণ্য তুমি কার?

কালাকাদ-মুন্দান্থুরাই টাইগার রিজার্ভের অভিজ্ঞতা

শান্তনু গুপ্ত

দ্বিতীয় পর্ব

৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তামিলনাড়ুর বন দপ্তর তাদের সমস্ত সরকারি শক্তির প্রয়োগ করেও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণ প্রান্তের এই অমূল্য জৈব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে পারছিল না। ভোর পাঁচটা থেকে গ্রামের স্ত্রী পুরুষ ৫-৭ জনের দল মিলে খাবার-দাবার কাপড়ে বেঁধে কোমরে দাঁ (তামিল ভাষায় আরুবা) নিয়ে অভয়ারণ্যের পূর্ব পাদদেশ দিয়ে পার্কে ঢুকে পড়ত। বন দপ্তরের ক্ষমতা ছিল না প্রায় ১১০ কিমি লম্বা গ্রাম দিয়ে ঘেরা এই পূর্ব প্রান্তের জঙ্গলের সব ঢোকার পথে রক্ষী মোতায়েন করা। এই জ্বালানি কাঠ সংগ্রহকারীরা মূলত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক (৬৭% পরিবার ভূমিহীন শ্রমিক)। অভয়ারণ্যের পাশের এলাকার নাম বিক্রমসিঙ্ঘপুরম। সেখানে অরণ্যের পাদদেশে রয়েছে মাদুরা কোটস্ টেক্সাইল মিল। এই ভূমিহীন শ্রমিকেরা সপ্তাহে দুই তিন দিন এই মিলে কাজ করত। যে দু-তিন দিন বসে থাকত, সে সময় ধান কাটার মরসুম হলে হয় ক্ষেত থেকে রোজগার, না হলে অভয়ারণ্যে ৫-৬ ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে এক বান্ডিল জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করত। সাধারণত পুরুষরা ৫০-৬০ কেজি আর মহিলারা ৪০-৫০ কেজির জ্বালানি কাঠ একবারে সংগ্রহ করে আনত (Gupta &Mishra 1999)। ৯০ দশকের শেষের দিকে তখন দক্ষিণ তামিলনাড়ুর একটু অবস্থাপন্ন গ্রামগুলোতে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ আর ধান কাটার মেশিন চলে এসেছে। তাই এই শ্রমিকদের কাছে চাষের কাজ নিয়মিত না আসায় তাদের জ্বালানি কাঠ বিক্রিই দৈনিক রোজগারের পথ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শুরুর দিকে সার্ভে করে দেখেছিলাম যে এই অভয়ারণ্যের প্রত্যেকটা ফরেস্ট বিটেই (১০০%) জ্বালানির কাঠের জন্য গাছ কাটা পড়ছে (FREEP-KMTR Research Project Report 2000)। প্রায় ৮৫ শতাংশ সংগ্রহই হচ্ছে বাড়িতে, চায়ের দোকানে আর হোটেলগুলোতে বিক্রি করার জন্য। বাদবাকি ১৫% নিজের ব্যবহারের জন্য।

কৃষিভিত্তিক শ্রম যে অন্য মাসগুলোতে একদম বন্ধ থাকত, সে সময় একজন জ্বালানি সংগ্রহকারী দিনে দু'বার করে কাঠ কাটতে যেত। প্রতি কেজিতে ১-২ টাকা দাম পেত (Gupta, 2000)। এইভাবেই সংসার চলত। তাই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ফাইন, গার্ডের হুমকি কিছুই কাজে আসত না। গবেষণার প্রথম দিকে ডেটা নিয়ে দেখেছিলাম যে কে এম টি আর-এর আশপাশের গ্রামগুলোর প্রায় ৭৫ হাজার মানুষের জ্বালানি কাঠের প্রয়োজনের (প্রতিদিন মাথাপিছু ১.২ কেজি কাঠ প্রয়োজন) মোট ৬৭% সংগ্রহ করা হয় সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে। এছাড়াও পাহাড়ের পাদদেশের জঙ্গলে এই গ্রামগুলো থেকে আসা প্রায় ৫০ হাজার গবাদি পশু অরণ্যের হরিণ, বাইসনদের সাথে একই জায়গায় চরে বেড়াত (Dutt 2001)। এগুলো দুধেল গরু নয়। গ্রামবাসীরা এদের গোবর থেকে জৈব সার তৈরি করে কেরালায় ট্রাক ভর্তি করে পাঠাত। কিন্তু দুধেল গরু নয় বলে এদের জন্য খাবার কিনতো না। অভয়ারণ্যে ছেড়ে দিত। এইসব আটকাতে বনবিভাগ হিমশিম খেত আর গ্রামের লোকের সাথে নিত্যনতুন ঝামেলায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মানুষের শত্রুতে পরিণত হচ্ছিল। একদিকে বনবিভাগ মানুষকে

অরণ্য থেকে কাঠ সংগ্রহ করতে, ওষধি বৃক্ষ থেকে মূল্যবান অংশ সংগ্রহ করতে, জৈব সারের পক্ষে মূল্যবান পাতা সংগ্রহ করতে বাধা দিচ্ছে। গরু ছাগল চরাতে বাধা দিচ্ছে। সেটা না করলে কে এম টি আর-এর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে, বাঘের বিচরণ ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাঘের সাথে অন্য বন্য জীবরাও সংকটে পড়বে। অন্যদিকে দৈনিক মজুরির শ্রমিক পরিবারগুলোর জন্য জঙ্গলের কাঠ বিক্রিই হল বেঁচে থাকার মূল উপায়। হিসেব করে দেখা গেছে, ভারতের ৬৪% অভয়ারণ্যে এই সমস্যাটি তীব্র (Kothari et al. 1989)। কে এম টি আর-এ ১৯৯৫ সাল থেকে এর সমাধানে Eco-development Project (FREEP-KMTR Pilot Project) চালু করা হয়।

ভারতে এই মুহূর্তে ১০৬টি ন্যাশনাল পার্ক, ৫৭৩টি ওয়াইল্ড স্যাংচুয়ারি আছে, যা দেশের প্রায় ৫৬৩ শতাংশ জমির সমতুল্য। এই সব অভয়ারণ্য স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের জৈব বৈচিত্র্যকে সফলভাবে রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু এইভাবে সংরক্ষণের মূল সমস্যা হল এতে সাধারণ মানুষের অধিকার আর অংশিদারিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। পুরোটাই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের নিয়ন্ত্রণে। গরীব মানুষের জীবিকা যেখানে বনের সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে অভয়ারণ্যকে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে আর রক্ষী দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা খুব মুশকিল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাজেটও সীমিত। তাই ৯০-এর দশক থেকে ভারতে Eco-development concept এসেছে। বনের ওপর নির্ভরশীল গরীব মানুষের উন্নয়ন আর বন্য জীবন সংরক্ষণ এখন আর বিপরীত বিষয় নয়। বরং একে অপরের পরিপূরক। মানুষের অভয়্যরণের সম্পদের ওপর জীবিকার নির্ভরশীলতা কমাতে পারলে তবেই বন্য জীব সুরক্ষিত থাকবে। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা আর অংশগ্রহণ ছাড়া অরণ্যকে রক্ষা করা অসম্ভব ---এই ধারণা থেকেই ecodevelopment। ভারতে প্রায় ১০ কোটি জনজাতি জঙ্গলের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল (Lynch 1992)। এদের অরণ্য ছাড়া অন্য জীবিকার ব্যবস্থা না করলে অভয়ারণ্যগুলো টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না (Brandon and Wells 1992)। সেই জন্য ১৯৯৫ সালে কে এম টি আর-এ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহায়তায় ecodevelopment-এর pilot project শুরু করা হয় মূলত এই জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ আর cattle grazing বন্ধ করার জন্য।

তথ্যসূত্র

Annamalai, R. (2004). *Eco Development in Kalakad Mundanthurai Tiger Reserve, India*. Status Report. Tamil Nadu Forest Department. 253p.

Gupta, S. and Mishra, B.K. (1999). *Quantification of Anthropogenic Pressure in Kalakad-Mundanthurai Tiger Reserve.* Gupta, S. and Mishra, B.K. (1999). 426p

Ecological and socio-economic studies on the Kalakad-Mundanthurai Tiger Reserve: An Ecodevelopment Approach; Forestry Research Education and Extension Project

Gupta, S (2016) Ph D thesis: *An assessment of livelihood dependency and anthropogenic pressures on the tiger habitat in Kalakad-Mundanthurai Tiger Reserve, India*

Kothari (1989). *Management of National Parks and Sanctuaries in India*. Indian Institute of Public Administration.

Wells, M., K. Brandon & L. Hannah. (1992). *People and Park: Linking Protected Area Management with Local Communities.* World Bank Publications, Washington, D.C.

Lynch, O.J. (1992). Securing community based tenurial rights in the tropical forests of Asia –an overview of current and prospective strategies. Issues in Development, World Resources Institute, Washington. Pp 2.

উমা

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পত্রিকার কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। — সম্পাদকমণ্ডলী

পরিবেশের জন্য বিকল্পপ্রোটিন এবং বদলাতে হবে ফ্যাশনের ভাবনাও

নন্দগোপাল পাত্র

প্রোটিনের চাহিদা বিশ্ব জুড়ে বাড়ছে। তার একটা কারণ হল মানুষের মাংস আর দুধ প্রীতি। অরেকটা কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এই চাহিদার জোগান দিতে গিয়ে প্রাণী পালন বাড়ছে। প্রাণী পালনে পৃথিবীর অসুস্থতা বাড়ছে। মাংস ও দুধের জন্য পালন করা প্রাণীদের খাদ্য জোগান দিতে কৃষিজমি ও বন ধ্বংস হয়। জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়। দূষণ ও বর্জ্য বাড়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্কটের কারণ হয়। এই ক্ষতি ঠেকানোর বিকল্পের সন্ধানে ছিলেন বিজ্ঞানীরা। এই বিকল্পের সন্ধান মিলেছে বলে জানাচ্ছে রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ প্রকল্প বিভাগ (ইউএনইপি)।

গত বছরের ৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, জনপ্রিয় প্রাণীজ প্রোটিনের বিকল্প হতে পারে গবেষণাগারে তৈরি মাংস বা গাঁজানো ছত্রাক, শৈবাল। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রচলিত দুধ ও মাংসের বাজারের অর্ধেক দখল করে নেবে এই বিকল্প প্রোটিন।

মাংস ও দুধের বিকল্প খাবারগুলো কী? উদ্ভিদ থেকেও তৈরি করা হবে এই খাবার। আবার জীবন্ত প্রাণীর কোষ নিয়ে তা গবেষণাগারে বৃদ্ধি করে তৈরি করা হবে। এছাড়াও ইস্ট, ছত্রাক এবং শৈবাল গাঁজিয়ে তৈরি করা হবে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার মানুষের প্রোটিনের বিকল্প উৎস হবে এই খাবার। প্রতিবেদনে দু'ধরনের পদ্ধতিতে খাবার তৈরির কথা বলা হয়েছে। 'বায়োমাস ফার্মান্টেশন' এবং 'প্রিসিসন ফার্মান্টেশন'। প্রথম পদ্ধতিতে প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া অণুজীব গাঁজিয়ে খাবার তৈরি হবে। এই খাবারগুলো হবে প্রোটিন সমৃদ্ধ। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অণুজীবের অংশ নিয়ে তৈরি হবে। এগুলোর সাহায্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে খাবারে গন্ধ, ভিটামিন ও স্নেহ পদার্থ যোগ করা যাবে।

কেমন হবে বিকল্প খাবারের স্বাদ? গত কয়েক বছরে বেশ কিছু দেশ ও সংস্থা বিকল্প খাবারের উন্নতিতে এবং বিপণনে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। বিশ্বে উদ্ভিদজাত মাংসের খুচরো বাজারের মূল্য ২০২১ সালে ছিল ৫৬০ কোটি ডলার। এই পণ্যের কিছু কিছু দেখতে, আকারে এবং গন্ধে মাংসের মতোই। তবে সব ক্রেতা এই বিকল্প মাংসের স্বাদে প্রভাবিত হন নি।

মাংস ও দুধের বিকল্প খোঁজার দরকার হল কেন? বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০০ কোটি ছুঁয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে মাংসের চাহিদা ৫০ শতাংশ বাড়বে। প্রাণীজ প্রোটিন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি দেয়। কিন্তু এই মাংসের উৎপাদনে পরিবেশের বেশ কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়। গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন হয়, অরণ্য কমে, জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়। সর্বোপরি দূষণ হয়। জলবায়ু পরিবর্তনে ডেয়ারি ও মাংস শিল্পের অবদান যথেষ্ট। এটা বিজ্ঞানীরাই জানাচ্ছেন। মাংস ও দুধ উৎপাদন করতে প্রচুর জমি লাগে। কৃষি ক্ষেত্রের গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদনের দুই তৃতীয়াংশ আসে মাংস আর দুধের খামারগুলো থেকে। জলবায়ু পরিবর্তনে গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাব বেশি। মাংস ও দুধ উৎপাদনে যেমন গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন হয়, তেমনই জমির পরিমাণ কমে। এর পাশাপাশি সভ্যতাকে ঠেলে জল সংকটের দিকে। প্রাণিজ খাবার উৎপাদনে বেশি জল লাগে। ওয়াটার ফুট প্রিন্ট অনুসারে এক কেজি গরুর মাংস, এক কেজি ভেড়ার মাংস, এক কেজি মুরগীর মাংস, এক লিটার দুধ, একটি ডিম উৎপাদন করতে যথাক্রমে ১৫৪১৫, ১০৪১২, ৪৩২৫, ১০২০, ১৯৬ লিটার জল লাগে। অন্যদিকে এক কেজি আলু, এক কেজি বাঁধাকপি, এক কেজি টম্যাটো উৎপাদন করতে যথাক্রমে ২৮৭, ২৩৭, ২১৪ লিটার জল লাগে। তালিকা থেকে স্পষ্ট প্রাণীজ প্রোটিন উৎপাদনে জলের পরিমাণ বেশি লাগে। উৎপাদকেরা ভেবে দেখেন না কতটা জল তোলা হল বা খোঁজ নেন না ওই এলাকা ভূগর্ভস্থ জলের নিরিখে সঙ্কটজনক কি না। এও দেখা যায় সংশ্লিষ্ট উৎপাদকের কলে আর জল উঠছে না। করুণ মুখে দেখেন, রাস্তা দিয়ে ভ্যানে করে চলেছে জলের জার। কিনতে পারলে তবেই মিটবে তেষ্টা। না মেটাতে পারলে প্রতি বছর পানীয় জলের সমস্যায় মৃত দু'লক্ষ মানুষের সংখ্যাটা আরও বাড়বে সুতরাং পরিবেশ বাঁচাতে আমাদের গবেষণাগারে তৈরি বিকল্প মাংস ও দুধের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

দুধ আর মাংসের এই নতুন বিকল্প পরিবেশের পক্ষে কতটা

সহায়ক? ইউএনপি জানাচ্ছে, এখনও আরও গবেষণা প্রয়োজন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে দেখা গিয়েছে, প্রচলিত দুধ ও মাংসের থেকে বিকল্প উৎপাদন পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের পক্ষে তুলনামূলক ভাল। বিশেষ করে কার্বন নির্ভর শক্তি ব্যবহার না করে এর উৎপাদন হলে ভাল। রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রতিবেদন একটা তুলনামূলক পরিসংখ্যান রয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, গরু, শুয়োর বা মুরগির মাংসের জোগানের থেকে উদ্ভিদ নির্ভর প্রোটিন পণ্যে ৯৭ শতাংশ জমি কম লাগে। বিদ্যুৎ খরচ ৩০-৩৫ শতাংশ কম হয়।

কার্বন নির্গমনের আরও একটি বড় কারণ হল ভোগ্য দ্রব্যের মাত্রাহীন ব্যবহার। পুঁজিপতি এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীরা আরও বেশি মুনাফা অর্জনের তাগিদে মানুষের সামনে নিত্যনতুন নয় ভোগ্যদ্রব্যের পসরা সাজিয়ে কৃত্রিম এক চাহিদা তৈরি করছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই ভোগ্যদ্রব্যগুলি ব্যবহার করলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন বাতাসে মেশে। ভোগবাদের এই চরম অবস্থাকে আটকানো বা কমানোর কোনও উদ্যোগই চোখে পড়ছে না।

গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন বা বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য পরিবর্তন করা দরকার সারা পৃথিবী জুড়ে জমির ব্যবহারে, চাষাবাদে এবং মানুষের খাদ্যে। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং জমি নিয়ে 'ইন্টার গভার্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' (আইপিসিসি)-এর একটি বিশেষ রিপোর্ট জানাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করার জন্য উদ্ভিদ-নির্ভর খাদ্যের ব্যবহার প্রয়োজন।

আমরা সকলে অঙ্গীকার করি যে সবাই মিলে গড়ে তুলব নতুন পৃথিবী। নিয়ম করে বাড়িতে গাছ লাগাব। সেই সঙ্গে পরিবেশের দূষণ হয় এমন কোনও কিছু ব্যবহার করব না। এই দূষণের কথা মাথায় রেখে ফ্যাশনেও এসেছে পরিবর্তন। ইকো ফ্রেন্ডলি ফ্যাশনের দিকেই ঝুঁকছেন ডিজাইনাররা। এমন কিছু মেটেরিয়াল ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে যা মাটির সঙ্গে সহজেই মিশে যেতে পারে। সেই সঙ্গে মানুষ যা পরে আরাম পেতে পারেন। ইকো ফ্রেন্ডলি পোশাকের জন্য সবাইকে উৎসাহ দিতে হবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্র্যান্ড যাতে এগিয়ে আসে সেইদিকে নজর দেওয়া দরকার। পুরনো পোশাক ফেলে না দিয়ে রিমডেলিং করতে হবে। ছেঁড়া থাকলে নিজের মতো সেলাই চালিয়ে কিংবা পেন্ট করে অন্যরকম লুক দেওয়া যেতে পারে। কীভাবে পুরনো পোশাককে অন্যরকমভাবে লুক পরিবর্তন করা যায় এই সংক্রান্ত অনেক রকম ভিডিও পাওয়া যায় সোশ্যল মিডিয়ায়। জামা কাপড় পরিমাণে কম কিনুন অধিক কিনে নষ্ট করবেন না। এমন কিছু কিনুন যা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উমা

মাইক্রোপ্লাস্টিক

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনি কি জানেন এক গ্লাস জল খেলে আপনি কতটা মাইক্রোপ্লাস্টিক গিলে খাচ্ছেন?

হ্যাঁ, ওই প্লাস্টিকের বোতল থেকে জল খাবার কথাই বলছি। প্রায় এক হাজার মাইক্রোপ্লাস্টিক খেয়ে ফেলছেন। এখন প্রশ্ন হল, মাইক্রোপ্লাস্টিকটা কি? এটি হল আমাদের এই প্লাস্টিকেরই অতি ক্ষুদ্র কণা যা চোখে দেখাই যায় না। এই মাইক্রো প্লাস্টিক এখন বহু মানুষ সহ সমস্ত প্রাণীকুলকে বিপন্ন করছে বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত।

যে সমস্ত খাবার যা প্লাস্টিক প্যাকেট হয়ে আমাদের হাতে আসছে তার সবার সঙ্গে মিশে আছে প্লাস্টিকের গুঁড়ো। সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ছে নুন ও চিনির প্যাকেটে, যা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। এই অদৃশ্য মাইক্রোপ্লাস্টিক শরীরের কি ক্ষতি করছে? এগুলো খাদ্যের সাথে পেটে গিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মনুষ্য দেহে কিডনি, হার্ট এমনকি মস্তিষ্কেও প্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে, তৈরি হচ্ছে নানা জটিল রোগ। এখন আপনি ভেবে দেখুন, কোন খাবারটা আপনি প্লাস্টিক মোড়ক ছাড়া পাচ্ছেন। নুন চিনি থেকে শুরু করে তেল, জল, বিস্কুট, লজেন্স, চাল, ডাল কোনোটাই প্লাস্টিকের ছোঁয়া থেকে মুক্ত নয়। বাজারের কাটা মাছ মাংস আমরা বাড়ি আনছি প্লাস্টিকের প্যাকেটে। সব খাবারেই আমরা খাচ্ছি মাইক্রোপ্লাস্টিক, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। মোটা প্লাস্টিকগুলো মন্দের ভাল হলেও, পাতলাগুলো মারাত্মক ক্ষতিকারক। তাছাড়া থার্মোকলের থালা, বাটি, গ্লাস, কাপ

ওগুলোও তো প্লাস্টিকের মাসতুতো ভাই। ওগুলো সবই পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট। পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝেই দেখা যায় সমুদ্রে বড় বড় প্লাস্টিকের ব্যাগ খেয়ে প্রকাণ্ড তিমি মাছ মারা যাচ্ছে। তাদের পেটে জমা হচ্ছে কুইন্টাল কুইন্টাল প্লাস্টিক। সমুদ্র, নদীর জলজীবী প্রাণীরা প্লাস্টিকে বিপন্ন হচ্ছে। মাছ কচ্ছপ কেউ বাদ যাচ্ছে না।

মাইক্রোপ্লাস্টিকের কুফল কৃষিতেও। টন টন ইউরিয়া সারের প্লাস্টিক বস্তার মধ্যে বিস্তর বড় সাইজের মাইক্রোপ্লাস্টিক যেগুলো মাটির ছিদ্রপথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে, বৃষ্টির জল ভূ-স্তরের নিচে যেতে পারছে না, ভূগর্ভস্থ জল সঞ্চয় ব্যাহত হচ্ছে। অতি ক্ষুদ্রগুলো শোষিত হচ্ছে ফসলের গাছে, যা পরবর্তীতে মানুষের পেটে যাচ্ছে। সুন্দরবনের মতো বাদাবনেও মাইক্রোপ্লাস্টিক ঢেকে দিচ্ছে মাটি, শ্বাসমূলেরা শ্বাস নিতে পারছে না। প্লাস্টিক প্যাকেজিং যে সমাজে কি সর্বনাশ করছে তা এসব থেকেই স্পষ্ট। সুতরাং প্লাস্টিক আর মাইক্রোপ্লাস্টিকের সাঁড়াশি আক্রমণে জীবজগৎ আজ সত্যিই বিপন্ন।

উ মা

চতুর্দশ স্মারক বক্তৃতা কেমন হল

গত ২৩ নভেম্বর ২০২৪ মহাবোধি সোসাইটি হলে উৎস মানুষ পত্রিকার আয়োজনে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা সভায় উপস্থিত ছিলাম।

সীমিত সংখ্যক (মেরেকেটে ৪৫ জন) শ্রোতার, যাঁদের অধিকাংশই ষাটোর্ধ। আলোচ্য বিষয় ছিল 'চোপ উন্নয়ন চলছে' বক্তা অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস প্রায় পঞ্চাশ মিনিট টানা বলে গেলেন।

নির্ধারিত অনুষ্ঠান সূচি ঘোষণার পর দুটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন বনশ্রী চক্রবর্তী। এরপর উৎস মানুষের বর্ষীয়ান সদস্যা পূরবী ঘোষ উৎস মানুষ ও প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-কে নিয়ে দু'চার কথা বলে বক্তা শ্রী পার্থপ্রতিম বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

পার্থবাবু সুচারুভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। বক্তৃতার শেষে শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। কিন্তু এই বক্তৃতা আমার মনের চাহিদা মেটাতে পারে নি। তাই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

পার্থপ্রতিমবাবু আধুনিক মেকি উন্নয়নের উপর সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন ঠিকই কিন্তু উনি বিশেষত অপরিকল্পিত ও ধ্বংসাত্মক নগরায়নের কথার ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। সঙ্গে অবশ্যই নদী পরিকল্পনা ও পাহাড়ে অপরিকল্পিত উন্নয়নের কথাও বলেছেন। একথা সত্যি সারা বিশ্ব জুড়ে নগরায়নের ঠেলায় আমাদের প্রিয় বসুন্ধরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশাল বিশাল সুউচ্চ ইমারতসমূহ শহরে বিভিন্ন কাজের তাগিদে বহিরাগত মানুষজনের আবাসনের সমস্যা আপাতভাবে মেটালেও আদতে তা নগর সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বনাঞ্চল সাফ করে, জলাভূমি বুজিয়ে নগরের বৃদ্ধি ঘটানোয় বৃষ্টিপাত কমছে, তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে এবং বিপুল পরিমাণে আবর্জনা জমা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশও দূষিত হচ্ছে। আধুনিক যুগের আবর্জনা ধ্বংস হতে বছরের পর বছর সময় লাগে। তথাকথিত শহরকেন্দ্রিক উন্নয়নের ঝাঁ চকচকে রূপ গ্রামের মানুষকে শহরমুখী করছে। কংক্রিটের জঙ্গলের চাপে পরিবেশের দফারফা হচ্ছে সেদিকে নজর নেই। বক্তা তা নিয়ে ভারি সুন্দর উদাহরণ তুলে ধরলেন। ফুটপাথ আছে, রাস্তা আছে — দুয়ের মাঝে মাটির দেখা নেই। অথচ বৃষ্টির জল ভূগর্ভে পৌঁছনোর জন্য যা থাকা জরুরি ছিল। লাগামছাড়া অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে সেদিকটা নিয়ে বক্তা আমাদের সতর্ক করেন।

পার্থপ্রতিমবাবু বোধহয় সময়ের অভাবে শুধু নগরায়নের কথাই বলেছেন। কিন্তু বলেন নি শিক্ষা ব্যবস্থার কথা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা, সামাজিকতার কথা। তাঁর বক্তব্য আমার মনকে কিছু কথা বলার ইন্ধন জুগিয়েছে।

প্রথমেই বলি : শিক্ষা ব্যবস্থার কথা — আমার মতো বয়স্ক যাঁরা আছেন, তাঁরা খেয়াল করবেন যে সব বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের বাল্যকাল বা বলা যায় ছাত্রাবস্থা কেটেছে আজ সেই প্রতিষ্ঠাগুলো হয় বন্ধ হয়ে গেছে অথবা ছাত্রহীনতায় ধুঁকছে। সেই জায়গায় গড়ে উঠেছে ব্যক্তি মালিকানাধীন চটকদার অন্তঃসারশূন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সেখানে বিদ্যা শিক্ষার ব্যয় গরিব বা নিম্ন মধ্যবিত্তদের প্রায় সাধ্যের বাইরে। সেখানে ছাত্র-শিক্ষক সুমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। তৈরি হয় ছাত্রদের মধ্যে ভয়ঙ্কর এক অপ্রীতিকর প্রতিযোগিতা যা ছাত্রসমাজকে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক করে

তুলছে। তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চলত ছাত্রদের দেওয়া সামান্য মাইনে ও সমাজের কিছু শিক্ষাপ্রেমী মানুষের অনুদানে। সঙ্গে সরকারি অল্প কিছু অনুদান। আভিজাত্য দর্শানোর কোনো স্থান সেখানে ছিল না বলা যায়; আজও যে গুটি কয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিমটিম করে চলছে সেখানেও নেই। মেকি উন্নয়নের ঠেলায় শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে।

এরপর আসা যাক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথায়। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে প্রায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। যেটুকু সরকারি অধীনে আছে, তা দুর্নীতির আখড়া। যার ফলে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রায় দুর্লভ। পক্ষান্তরে আমজনতা বাধ্য হয়ে ঝুঁকছে চটকদার বেসরকারি নার্সিংহোমগুলির দিকে।

সেখানেও সঠিক চিকিৎসা কতদূর হয় সন্দেহ আছে; রোগী ও তাঁর প্রিয়জনকে সর্বস্বান্ত করার ব্যবস্থা করাই থাকে। এইসব বেসরকারি নার্সিংহোমগুলির বাজার কলকাতার মতো বড় শহরগুলিতে। ফলে ভাল চিকিৎসা পাবার লোভে গ্রাম-গঞ্জ এমনকি পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও দেশ থেকেও মানুষ শহরে ভীড় জমায়। শহরের চাপ বাড়ছে। এটাও উন্নয়নের খেসারত।

সবশেষে সামাজিকতার কথা। তথাকথিত উন্নয়ন (?) যখন শহর তথা দেশের বুকে বসে রক্ত চোষা শুরু করে নি তখন মানুষ পাড়া প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়ে জীবন কাটাত। কিন্তু বর্তমানে উন্নয়নের ঠেলায় পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দাকে আমরা চিনি না। এখনও যদি আমরা মেকি উন্নয়ন স্তব্ধ করে প্রকৃত উন্নয়নের দিকে পা না বাড়াই তাহলে আমরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশার অতলে তলিয়ে যাব।

প্রতিবেদক — অঞ্জন ঘোষ

উমা

সংগঠন সংবাদ

শিক্ষিত সমাজের সর্বস্তরে আলোচনা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে জল সংকটের তীব্রতা ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। ভূগর্ভস্থ জলের অপরিমিত ব্যবহারের ফলে ভারতের মতো দেশও এখন জলসংকটে ভুগছে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এত আলোচনা সত্ত্বেও এত স্ববিরোধ কেন? এর অন্যতম কারণ বোধহয় যে সব কথা আলোচিত হয় তার সাথে আমাদের যাপিত জীবনের ক্রমবর্ধমান দূরত্ব। গত ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪, শনিবার 'মেলবন্ধন'-এর উদ্যোগে ও বাণেশ্বর ট্রাস্ট, সল্ট লেক-এর সহযোগিতায় কলকাতার শ্যামবাজারের সেরাম অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয় ছিল — **জলযাপন**। অনুষ্ঠানে নদী বাঁচাও আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সেনানী শ্রী তাপস দাস শোনান তাঁর অভিজ্ঞতার কথা; ফল আশানুরূপ না হলেও হাল না ছাড়ার কথা বলেন। স্কুল অব হিস্টরিকাল স্টাডিজ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. ইলোরা ত্রিবেদী আলোচনা করেন বিভিন্ন নদীমাতৃক সভ্যতা এবং তার পরবর্তী সময়ের ভিন্ন ভিন্ন জলসেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে। এই সমস্ত পদ্ধতিতেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে ব্যবহার করার উপরে। লেখিকা ও পরিবেশবিদ শ্রীমতি জয়া মিত্র বলেন, সরল, মিতব্যয়ী জীবনযাত্রা, পারস্পরিক ভালবাসা ও বিশ্বাস যদি মূল মন্ত্র হয় আমাদের যাপনের, তবে সব সমস্যাকেই মোকাবিলা করা যায়। সাড়ে তিন ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে আলোচনার পাশাপাশি ভাটিয়ালি ও সারি গান গেয়ে শোনান রণিত ও অনির্বাণ, গানটি করেন স্কুল ছাত্রী জুন এবং মেয়েদের জলের গান গেয়ে শোনান গবেষিকা শ্রীমতি চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়। সভাঘরকে তাদের হাতের ছবি দিয়ে রঙিন করে তুলেছিল শিশুরা। 'স্বত্যয়ন'-এর বিশেষ বাচ্চাদের হাতে তৈরি ফোল্ডার উপহার হিসেবে দেওয়া হয় আলোচক ও শিল্পীদের। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শ্রোতাদের সাথে আলোচকদের মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়।

প্রতিবেদক — প্রশান্ত দাস

উমা

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00
৪৫তম বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯৪৩৩০৩৬৫৩৩

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
হারিতের ফোন নং — +৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বাবদ ২৫০ টাকা পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।
Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0008320
বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। ডাকে পত্রিকা না পেলে আমরা সংখ্যাটি দ্বিতীয়বার পাঠাতে পারব না। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা করা হয়।

ওয়েবসাইট : https://www.utsomanush.com
ই-মেল : utsamanush1980@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে:	
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	১৫০.০০
স্বাস্থ্যের সাতকাহন ১ম খণ্ড : গৌতম মিস্ত্রী	২০০.০০
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১৩০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	১৫০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	
নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	
অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১২০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ:	
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু:	
হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, সেতু প্রকাশনী, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। প্রতিক্ষণ, ৫ সূর্য সেন স্ট্রীট।
হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।